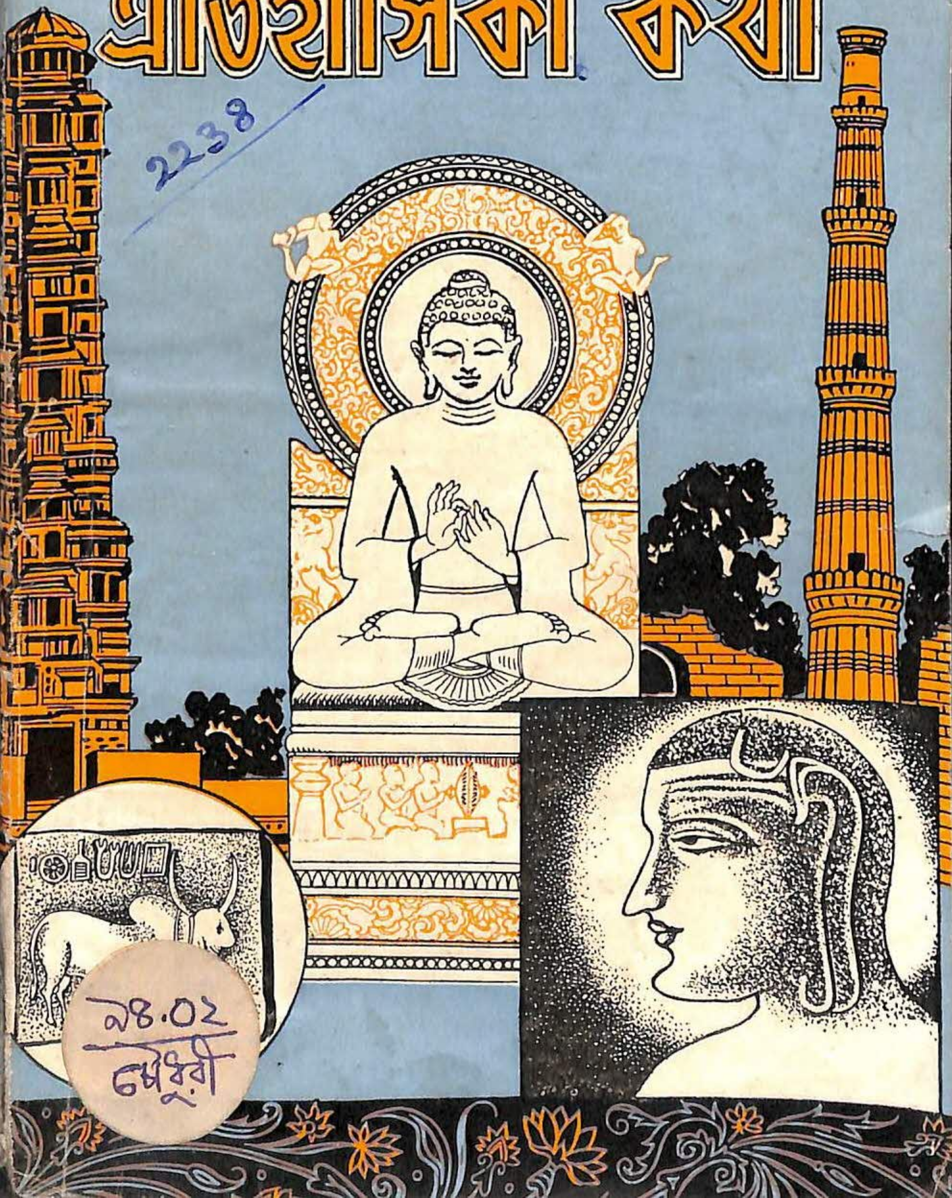
প্রাথমিক ঐতিহাসিকী কথা



APPROVED by the D. P. I. of West-Bengal as a Textbook for use in Class V stage of all Schools and Madrasahs in West-Bengal. [West-Bengal Education Directorate, Notifictioan No. 9 T, B., dated the 21st November, 1953 : Vide—The Calcutta Gazette, dated the 3rd December, 1953.]



প্রাথমিক ঐতিহাসিকী কথা

দ্বিতীয় ভাগ

[পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য]

—*—

শিবপুর, দীনবন্ধু কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং
ঐতিহাসিকী কথা, ভূগোল-প্রবেশিকা, বাংলার ভূগোল,
ছোটদের ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী এম. এ., বি. টি.

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য ৸৶০ পনর আনা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো
৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৬০ বঙ্গাব্দ

মুদ্রাকর—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা


সূচীপত্র

প্রাথমিক ঐতিহাসিকী কথা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বাবুর ও দিল্লীর সুলতানির অবসান

মুহম্মদ তোগলকের খামখেয়ালীর ফলে তাঁহার জীবিত কালেই তাঁহার বিশাল রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। সেই ভাঙ্গন রোধ করিবার মত শক্তি তাঁহার পরবর্ত্তী সুলতানদের ছিল না। এই ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হইল যখন মধ্য এশিয়া হইতে তৈমুরলঙ্ আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। তৈমুরলঙের আক্রমণে দিল্লীর সুলতানদের যাহাও সামান্য ক্ষমতা ছিল তাহাও লোপ পাইল। দুই শত বৎসর চেষ্টার ফলে দিল্লীর সুলতানেরা যে বিশাল রাজ্য ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল। দিকে দিকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহ

ঘোষণা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। দিল্লীর সুলতানদের রাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া দিল্লী ও আগ্রার চারিপাশের ভূখণ্ড ব্যাপিয়া কোন রকমে টিকিয়া রহিল।

তোগলক বংশের পতনের পরে সৈয়দ বংশীয় কয়েকজন দুর্ব্বল পাঠান সুলতান অল্প কালের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদের পরে দিল্লীর সিংহাসন লোদী বংশীয় পাঠান সুলতানদের হস্তগত হয়। এই বংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকান্দর লোদী হিন্দু-ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তাঁহার হিন্দু প্রজাদের সহানুভূতি হারান। স্বজাতীয় পাঠান সর্দ্দারেরাও তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তৃতীয় এবং শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে পাঠান সর্দ্দারেরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে স্বজাতীয় পাঠান ও বিজাতীয় হিন্দু প্রজাদের সহানুভূতি হারাইয়া লোদী বংশীয় সুলতানেরা নিজেদের পতনের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ নিজের পুত্রের উপর ইব্রাহিম লোদীর দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কাবুলের বাদশাহ বাবুরকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন।

মধ্য এশিয়ায় ফরগনা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার নাম ছিল উমর শেখ মির্জ্জা। উমর শেখ মির্জ্জার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাবুর এগার বৎসর বয়সে রাজা হন। বাবুরের প্রকৃত নাম জহীরউদ্দীন মুহাম্মদ। তবে তিনি বাবুর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাবুরের পিতা ভারত আক্রমণকারী দুর্দ্ধর্ষ তুর্কী যোদ্ধা তৈমুরলঙেরই বংশধর এবং তাঁহার মাতা আর এক ভারত আক্রমণকারী বিখ্যাত মোগল যোদ্ধা চেঙ্গিজ খাঁর বংশের কন্যা। সুতরাং বাবুরের পিতা তুর্কী জাতীয় ও মাতা মোগল জাতীয় ছিলেন। কিন্তু মায়ের বংশ অনুসারে বাবুরকে মোগল বলা হইত।

এগার বৎসর বয়সে যখন এই বালক ফরগনার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার মিত্র অপেক্ষা শত্রুর সংখ্যাই ছিল বেশী। এই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যও হারাইতে হয়। অতঃপর নিঃসহায় অবস্থায় তাঁহাকে যে কত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ভাগ্যদেবী কখনও তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন, আবার কখনও বা বিমুখ হইয়াছেন। অনেক জয়-পরাজয়ের পর তিনি কাবুল অধিকার করিয়া ঐ দেশের রাজা হন। তখন তিনি 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন।



বাবুর

পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন উপায় নাই দেখিয়া বাবুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময়ে দৌলত খাঁর

আহ্বানে তিনি সেই সুযোগ খুঁজিয়া পাইলেন। বাবুর তাঁহার মোগল-বাহিনী লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন।

দৌলত খাঁ বাবুরকে ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কাজের সময় বাবুরকে সাহায্য না করিয়া তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতে লাগিলেন। সুতরাং বাবুর স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পরের বৎসর বাবুর পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইব্রাহিম লোদীও তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া বাবুরকে বাধা দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষ পানিপথ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য-সংখ্যা বাবুরের সৈন্য-সংখ্যা হইতে অনেক বেশী ছিল। কাজেই বাবুর অত্যন্ত ভীত হইলেন। কিন্তু ইব্রাহিম লোদীও সহসা আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। এইরূপ অবস্থায় কেহ কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া আট দিন বসিয়া রহিলেন। অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাবুরের কামান অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু বাবুরের সৈন্যেরা কামান হইতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিল। ইব্রাহিম লোদী বীরের মত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইব্রাহিম লোদীর প্রায় পনর-ষোল হাজার সৈন্য নিহত হইল। এই যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত।

পানিপথের যুদ্ধের পরে দিল্লী ও আগ্রা বাবুরের হস্তগত হইল। তাহার পর বাবুর উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করিবার

জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই রাজ্য বিস্তারে মস্ত বড় প্রতিবন্ধক ছিলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ। তিনি বহুদিন উত্তর ভারতে এক হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে এক মাত্র বাধা ছিল লোদী বংশীয় স্থলতানেরা। সুতরাং পানিপথের যুদ্ধে লোদী বংশের পতনে তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, পানিপথের যুদ্ধের পরে বাবুর তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ তৈমুরলঙের মত দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উত্তর-ভারতে এক বিশাল হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপন করা সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু যখন দেখা গেল বাবুরের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার কোন ইচ্ছাই নাই বরং রাজ্য বাড়াইবার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য বেশী তখন রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহ বাবুরের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন। তাঁহার মত যোদ্ধা তখন ভারতে আর কেহ ছিল না। তিনি যুদ্ধে এক চোখ, এক হাত ও একটি পা হারাইয়াছিলেন। যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। এইরূপ একজন যোদ্ধার সহিত অস্ত্রপরীক্ষা করিতে প্রথমে বাবুর একটু ভীত হইয়াছিলেন।

অবশেষে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য খানুয়া নামক স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। সমস্ত দিন ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যার সময়ে রাজপুতেরা পরাজিত হইল। অতঃপর রাণা সংগ্রাম সিংহ খানুয়ার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়া

এক দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এই পরাজয়ে রাণা সংগ্রাম সিংহের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। যুদ্ধের দুই বৎসর পরে রাণা প্রাণত্যাগ করিলেন।

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাবুর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেও তিনি ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। খানুয়ায় বাবুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাণা সংগ্রাম সিংহের পরাজয় ঘটিলে ভারতে তাঁহার রাজ্য-বিস্তারে আর কোন বাধা রহিল না। এইবার তিনি নিশ্চিন্তমনে রাজ্য-বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদী পাঠানদের সহায়তায় পূর্ব্ব ভারতে বাবুরকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু পাটনা শহরের নিকট গোগ্রা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে এই পাঠান বাহিনী বাবুরের নিকট সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। ইহাই গোগ্রার যুদ্ধ নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে বাবুর পানিপথ, খানুয়া ও গোগ্রা তিনটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উত্তর ভারতে নিজের আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর। ভারতবর্ষে চারি বৎসর রাজত্ব করিবার পর বাবুরের মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন

(১) বাবুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ। (২) প্রথম পানিপথের ও খানুয়ার যুদ্ধ বর্ণনা কর এবং ভারতে বাবুরের রাজ্য-বিস্তারে তাহাদের গুরুত্ব নির্দ্দেশ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শেরশাহ্

বাবুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হুমায়ুন দেখিলেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপদ্। মৃত্যুর পূর্ব্বে বাবুর তাঁহার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার আমীরেরা হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। এমন কি, হুমায়ুনের ভ্রাতারাও তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করিতে লাগিলেন।

একে ত' রাজপরিবারের মধ্যে অশান্তি, তাহার উপর আবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গোলযোগ। গুজরাটের শাসনকর্ত্তার দরবারে আশ্রয় পাইয়া হুমায়ুনের শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল ; সুতরাং গুজরাটের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে অভিযান করা প্রয়োজন। রাজ্যের পূর্ব্বদিকেও দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। পানিপথের যুদ্ধের পরে পশ্চিম ভারতে পাঠানদের ক্ষমতা খর্ব্ব হইলেও পূর্ব্ব ভারতে তখনও তাহারা বেশ প্রবল ছিল। হুমায়ুন যখন গুজরাটের শাসন-



হুমায়ুন

কর্ত্তাকে দমন করিতে ব্যস্ত তখন শেরখাঁ নামক এক পাঠান বীর বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন।

শেরখাঁ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের একজন পাঠান জায়গীরদারের পুত্র। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল ফরিদ। বিমাতার ষড়যন্ত্রে ও পিতার অনাদরে ফরিদকে সাসারাম ত্যাগ করিতে হয়। তখন জৌনপুর বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। ফরিদ জৌনপুরে যাইয়া ফারসী ও আরবী ভাষা এবং সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি এই বিষয়ে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তারপর বিহারের শাসনকর্ত্তার চেষ্টায় পিতা ও পুত্রের মধ্যে মিলন সাধিত হইল। ফরিদ সাসারামে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পিতার জায়গীর শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিমাতার চক্রান্তে আবার তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। অনেক দিন ধরিয়া নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ফরিদ বিহারের শাসন-কর্ত্তার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি একদিন তাঁহার প্রভুর সঙ্গে শিকার করিতে গিয়া স্বহস্তে এক ব্যাঘ্রকে হত্যা করেন। ইহা হইতে তাঁহার নাম হয় শের (ব্যাঘ্র) খাঁ। কিন্তু প্রভুর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় শের খাঁ চাকুরী ত্যাগ করিয়া আগ্রায় চলিয়া যান। এইখানে শের খাঁ বাবুরের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বাবুরকে যুদ্ধে সাহায্য করায় বাবুর সন্তুষ্ট হইয়া শের খাঁকে তাঁহার পিতার জায়গীরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শের খাঁর পূর্ব্ব প্রভু বিহারের শাসনকর্ত্তা পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র জালাল খাঁ বাবুর-কর্ত্তৃক বিহারের

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। জালাল খাঁ নাবালক ছিলেন বলিয়া শের খাঁ তাহার অভিভাবক হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে শের খাঁ সৈন্যদের সমর্থন লাভ করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি চুনার দুর্গের অধিপতির বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া চুনার দুর্গ হস্তগত করিলেন। শের খাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া জালাল খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার সহিত যুক্ত হইয়া শের খাঁকে দমন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সূরজগড়ের যুদ্ধে তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনী শের খাঁর নিকট পরাজিত হইল। ইহার পর শের খাঁই প্রকৃতপক্ষে বিহারের শাসনকর্ত্তা হইলেন। কিন্তু শের খাঁ চুপ করিয়া থাকিবার মত লোক ছিলেন না। তিনি বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

হুমায়ুন যখন গুজরাটের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন তখন শের খাঁ বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় দখল করিয়া বসিলেন। শের খাঁর এই উদ্ধত ব্যবহার হুমায়ুন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গুজরাটের যুদ্ধবিগ্রহ স্থগিত রাখিয়া বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। যখন হুমায়ুন বঙ্গদেশে পৌঁছিলেন তখন শের খাঁ গৌড় ত্যাগ করিয়া বিহারে আসিলেন। হুমায়ুন অনায়াসে গৌড় দখল করিয়া আমোদ-প্রমোদে রত হইলেন। ইত্যবসরে শের খাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে চৌসার নিকট

শের খাঁ তাঁহাকে বাধা দিলেন। তুমুল যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হইলেন। আর একটু দেরি করিলেই হুমায়ুন শের খাঁর হাতে বন্দী হইতেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। এই সময়ে নিজাম নামে এক ভিস্তিওয়ালা তাহার মশকের সাহায্যে হুমায়ুনকে গঙ্গা পার করাইয়া দেন।

নিজামের এই উপকারের কথা হুমায়ুন ভুলিলেন না। তিনি দিল্লীতে পৌঁছিয়া নিজামকে তাহার প্রার্থনানুযায়ী দুই দিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন। আমীরেরা হুমায়ুনকে যেরূপ সম্মান করিতেন, নিজামকেও তাঁহারা সেরূপ সম্মান করিলেন। এই দুই দিনের জন্য নিজাম মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

চৌসার যুদ্ধের পরে পূর্ব্ব ভারতে শের খাঁর শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। তিনি শেরশাহ্ নাম ধারণ করিয়া তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতার সংবাদ সকলকে জানাইয়া দিলেন। তাঁহার নামে মুদ্রা তৈয়ারী হইতে লাগিল। এই দিকে হুমায়ুন তাঁহার ভাইদের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য না পাইয়া শুধু নিজ বাহিনী লইয়াই শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু তিনি এবারেও কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অবশেষে হুমায়ুন তাঁহার পরিবারসহ পারস্য-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শেরশাহ্ এইবার দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন।

শেরশাহের রাজ্য-বিস্তার :— শেরশাহ্ হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরানও শেরশাহ্‌কে পাঞ্জাব ছাড়িয়া

দিয়াছিলেন। এইরূপে শেরশাহ্ বাংলা, আগ্রা, দিল্লী ও পাঞ্জাবের অধীশ্বর হইলেন। তারপর শেরশাহ্ মালব জয় করিয়া রাজপুতানা অধিকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন।



শেরশাহ্

খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ বাবুরের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে সমগ্র রাজপুত জাতির শক্তি খর্ব্ব হয় নাই। খানুয়ার যুদ্ধের পরে বাবুর কিংবা তাঁহার পুত্র হুমায়ুন তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই। সুতরাং এই মোগল-পাঠানের দ্বন্দ্বের সুযোগে রাজপুতেরা শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। শেরশাহ্ হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া রাজপুত জাতির প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

প্রথমেই তিনি রায়সিনের অধিপতি পুরণমলকে আক্রমণ করিলেন। পুরণমলও যথাসাধ্য বাধা দিলেন। অবশেষে শেরশাহ্ পুরণমলকে বিনা বাধায় ও অক্ষতদেহে দুর্গ হইতে চলিয়া যাইতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে পুরণমল অস্ত্রত্যাগ করিলেন। কিন্তু দুর্গ হইতে রাজপুতেরা বাহির হইয়া আসিলে শেরশাহের পাঠান সৈন্যেরা অতর্কিতভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। রাজপুতেরাও প্রথমে নিজেদের শিশুপুত্র ও স্ত্রীলোকদের

হত্যা করিল, তারপর পাঠান সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল।

শেরশাহ্ এইবার রাজপুতনার অন্তর্গত মাড়োয়ার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মাড়োয়ার একটি অনুর্ব্বর রাজ্য। বজরাই ইহার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কিন্তু এই অনুর্ব্বর মাড়োয়ার জয় করিতে শেরশাহ্‌কে এত বাধা পাইতে হইয়াছিল যে, তিনি যুদ্ধজয়ের পর বলিয়াছিলেন, "এক মুষ্টি বজরার জন্য আমি সমস্ত হিন্দুস্থান হারাইতে বসিয়াছিলাম!" তিনি রাজ-পুতানার কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণই শেরশাহের শেষ অভিযান। কালিঞ্জর দুর্গ জয় করিতে গিয়া শেরশাহ্ বারুদের আগুনে বিশেষ-ভাবে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর দুর্গটি অধিকৃত হয়।

শেরশাহের রাজ্যশাসন :—শেরশাহ্ রাজ্যশাসন-বিষয়েও অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন! তিনি কর্ম্মচারীদের উপর রাজ্যশাসনের ভার দিয়া নিশ্চিত থাকিতেন না, স্বয়ং রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। রাজ্যের সুশাসনের জন্য শেরশাহ্ তাঁহার রাজ্যকে ৪৭টি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশ আবার কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত হইত।

শেরশাহের পূর্ব্বে কোন ভারতীয় রাজা রাজ্য জরিপ করেন নাই। শেরশাহ্ তাঁহার রাজ্যের জমি জরিপ করাইয়া উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ * প্রজাদের খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

* সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশে **এক-চতুর্থাংশ** রাজস্বও আদায় করা হইত।

খাজনা ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য কিংবা মুদ্রার দ্বারা দেওয়া হইত। তাঁহারই সময়ে জমিতে প্রজাদের স্বত্বরক্ষার নিমিত্ত কবুলিয়ৎ ও পাট্টা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রজা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে জমি



শেরশাহের সমাধি (সাসারাম)

লইয়া সরকারকে যে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিত তাহাকে কবুলিয়ৎ এবং সরকারের নিকট হইতে প্রজা জমি দখল এবং ভোগ করিবার জন্য যে অধিকার-পত্র পাইত তাহাকে পাট্টা বলা হইত। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সময় রাজকোষ হইতে প্রজাদিগকে টাকা ধার দেওয়া হইত।

অশোকের ন্যায় তিনিও বড় বড় রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া তাহার দুই পার্শ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছিলেন।

এই সকল রাস্তার দুই পার্শ্বে পথিকদের বিশ্রামের জন্য দুই ক্রোশ অন্তর **পান্থশালা** স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল পান্থশালায় হিন্দু ও মুসলমানদের খাওয়া ও থাকার জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত ছিল। তিনি বঙ্গদেশ হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাই বর্ত্তমান কালের **গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক্ রোড**। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সত্বর সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তিনি **ঘোড়ার ডাকের** ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিক্ষুক ও দরিদ্রদিগকে অন্নদানের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি অন্নসত্র স্থাপিত হইয়াছিল।

তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা শান্তিতে বাস করিত। কোন গ্রামের মধ্যে চুরি-ডাকাতি হইলে গ্রামের মোড়লকে ও স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে তাহার জন্য দায়ী করা হইত। চুরি-ডাকাতির জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই সকল অপরাধের জন্য অনেক সময় অপরাধীকে প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত করা হইত। এইরূপ কঠোর ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে চুরি-ডাকাতি হ্রাস পাইয়াছিল।

শেরশাহ্ ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন ; কিন্তু অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। বিচারের সময় তিনি হিন্দু-মুসলমানকে সমান চোখেই দেখিতেন। হিন্দুদের সহিত তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন। তিনি জানিতেন হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষভাবে পোষণ করিয়া মুসলমান রাজার পক্ষে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করা ও তাহা রক্ষা করা দুষ্কর হইবে। রাজকার্য্যে তিনি জাতি-ধর্ম্ম বিচার না করিয়া গুণ অনুসারেই

লোক নিযুক্ত করিতেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামে তাহার এক বিখ্যাত হিন্দু সেনাপতি ছিলেন।

কৃতিত্ব :—শেরশাহ্ ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। সামান্য জায়গীরদারের সন্তান হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিশেষতঃ তিনি এই সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন পাঁচ বৎসরের মধ্যে। শুধু তাহাই নহে, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি শাসন-কার্য্যেরও অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন

(১) শেরশাহের জীবনী ও তাঁহার রাজ্য-স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(২) শেরশাহের রাজ্যশাসনপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা জান, বল। এই বিষয়ে অশোকের সঙ্গে শেরশাহের তুলনা কর।

কালরেখা
বাবুর হইতে হুমায়ুন

খৃষ্টাব্দ

১৫২৬.....পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ
১৫২৭.....খানুয়ার যুদ্ধ
১৫২৯.....গোগ্রার যুদ্ধ
১৫৩০.....বাবুরের মৃত্যু
১৫৩৯.....চৌসার যুদ্ধ
১৫৪০.....কনৌজের যুদ্ধ
১৫৪৫.....শেরশাহের মৃত্যু
১৫৫৫.....হুমায়ুনের দিল্লী অধিকার
১৫৫৬.....হুমায়ুনের মৃত্যু

স্কেল
১ ইঞ্চি = ৬ বৎসর

তৃতীয় অধ্যায়

আকবর

শেরশাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশধরদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে হুমায়ুন পারস্য-রাজের সাহায্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। বহু চেষ্টার পরে তিনি দিল্লী অধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু বেশী দিন রাজ্যসুখ ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। একদিন তিনি পুস্তকাগার হইতে নামিবার সময় পড়িয়া গিয়া আহত হন এবং তিন দিন পরে ইহলোক ত্যাগ করেন।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন যখন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পারস্যদেশে পলায়ন করিতেছিলেন তখন সিন্ধুদেশের অমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম হামিদাবানু। আকবর যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে হুমায়ুনের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ এই আনন্দের দিনে আমার এমন সম্বল নাই যে, আমি আপনাদিগকে কোন মূল্যবান দ্রব্য দান করিতে পারি। আমার সঙ্গে সামান্য মাত্র কস্তুরী আছে; আপনারা ইহার কিছু অংশ গ্রহণ করুন। আশীর্ব্বাদ করুন, এই কস্তুরীর গন্ধ যেমন চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে, আমার

২—২য়

পুত্রের যশঃ-সৌরভও যেন তেমনই চারিদিক আমোদিত করে।” আমীরদের আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয় নাই।

আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স তের বৎসর চারি মাস। সুতরাং এই অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ হুমায়ুন তাঁহার সাম্রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সময়ে আকবরের অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খাঁ।

বৈরাম খাঁ আকবরের পিসা। তখন সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া শেরশাহের একজন বংশধর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। ইঁহার নাম শাহ্ আদিল। শাহ্ আদিলের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নাম হিমু। হিমু একজন হিন্দু দোকানদার ছিলেন। এই সামান্য অবস্থা হইতে তিনি শাহ্ আদিলের সেনাপতি হইয়াছিলেন।

বালক আকবরকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া হিমু ভাবিলেন, এই সুযোগে হয়ত তিনি শাহ্ আদিলকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইতে পারিবেন। সুতরাং তিনি এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং সহজেই দিল্লী অধিকার করিলেন। কিন্তু হিমু শাহ্ আদিলকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন না, নিজেই ‘বিক্রমাদিত্য’ নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন।

আকবর ও বৈরাম খাঁ তখন পাঞ্জাবে ছিলেন। তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। হিমুও

তাঁহাদের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পানিপথ ক্ষেত্রে উভর পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। তুমুল যুদ্ধে হিমু পরাজিত হইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পরে হিমুকে ধরিয়া আনিয়া নিহত করা হইল। এই যুদ্ধ **দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ** নামে বিখ্যাত।



সম্রাট্ আকবর

বৈরাম খাঁর সাহায্যে আকবর আরও অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁ রাজকার্য্যে আকবরের কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না বলিয়া আকবর তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। আকবর এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। বৈরাম খাঁ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন, ইহা আকবরের ভাল লাগিত না। আকবরের মাতা হামিদাবানু এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও তাঁহাকে এই বিষয়ে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

অবশেষে আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিয়া নিজে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। তখন বৈরাম খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু আকবর তাঁহাকে পরাজিত করিলেন।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বৈরাম খাঁ আকবরের বশ্যতা স্বীকার

করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। ইহার পরে বৈরাম খাঁ মক্কা যাত্রা করিলেন। পথে একদিন এক আফ্‌গান দস্যু বৈরাম খাঁকে নিহত করে। এই দস্যুর পিতা এক যুদ্ধে বৈরাম খাঁর সৈন্যগণের হাতে নিহত হইয়াছিল। আজ বৈরাম খাঁকে হত্যা করিয়া সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইল।

সাম্রাজ্য-বিস্তার—আকবর ও রাণী দুর্গাবতী :— রাজ্য জয় করাতেই ছিল আকবরের আনন্দ। বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিবার পর আকবর **মালব** জয় করিবার জন্য সেনাপতি আধম খাঁ ও পীর মহম্মদকে প্রেরণ করিলেন। মালব জয়ের পরে আকবরের দৃষ্টি পড়িল গণ্ডোয়ানার দিকে। বর্ত্তমান মধ্য-প্রদেশের উত্তরাংশে তখন **গণ্ডোয়ানা** নামে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের বিধবা রাণীর নাম দুর্গাবতী। দুর্গাবতীর স্বামী এক নাবালক পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধবা রাণী দুর্গাবতী নাবালক পুত্রের নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যের প্রজারা সুখ-শান্তিতে বাস করিতেছিল। এমন সময় সম্রাট্ আকবরের এই রাজ্যের উপর নজর পড়িল। তিনি তাঁহার সেনাপতি আসফ খাঁকে এই রাজ্যটি অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন। রাণী দুর্গাবতী বিনা যুদ্ধে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না। বিশাল মোগলবাহিনী গণ্ডোয়ানা রাজ্য আক্রমণ করিল। রাণী দুর্গাবতী তাহাদিগকে বাধা দিলেন।

রাণী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হাতে তরবারি লইয়া রণে অবতীর্ণ হইলেন। হঠাৎ একটি তীর আসিয়া রাণীর

চোখে বিদ্ধ হইল। রাণী আর কোন উপায় না দেখিয়া আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করিলেন। রাণীর পুত্র বীরনারায়ণও মায়ের মত বীর ছিলেন। তিনিও মোগলদের



যুদ্ধক্ষেত্রে রাণী দুর্গাবতী

সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। অতঃপর গণ্ডোয়ানা রাজ্যের কিয়দংশ মোগল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আকবর ও মেবারের রাণা :—রাজপুতানায় রাজপুত জাতির বাস। রাজপুতেরা সাহসী যোদ্ধা। রাজপুতদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করা সহজসাধ্য নহে জানিয়া আকবর তাহাদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার উদার নীতির ফলে রাজপুত রাজগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। অনেক রাজপুত রাজা আকবরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আকবর রাজপুতনার

অন্তর্গত অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কেবল মেবারের রাণা উদয়সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে না পারিলে আকবরের মনে শান্তি নাই।



রাণা প্রতাপ সিংহ

যে সংগ্রামসিংহ বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, উদয়সিংহ তাঁহারই পুত্র। কিন্তু রাণা উদয়সিংহ পিতার মত বীর ছিলেন না। আকবর মেবার আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া রাণা উদয়সিংহ তাঁহার রাজধানী ত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয় লইলেন। মেবারের সর্দ্দারেরা চিতোর রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের নেতা হইলেন জয়মল্ল। আকবর তাঁহার বিপুল সৈন্যদল লইয়া চিতোর অবরোধ করিলেন। অনেক চেষ্টা

করিয়াও মোগল সৈন্যেরা চিতোরে প্রবেশ করিতে পারিল না। একদিন আকবর নিজের বন্দুকের গুলির দ্বারা জয়মল্লকে নিহত করিলেন। **জয়মল্লের মৃত্যুর পরে পত্তা সেনাপতি হইলেন।** পত্তা নিজের মাতা, স্ত্রী ও রাজপুত বীরদিগকে লইয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলেন না। আকবর চিতোর দখল করিলেন। রাণা উদয়সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি চিতোর পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ মেবারের রাণা হইয়াছিলেন।

আকবর ও বঙ্গদেশ :—বাংলার পাঠান সুলতান দাউদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আকবরের সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত একটি দুর্গ অধিকার করেন। এইবার আকবরের বঙ্গদেশ জয় করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হন এবং বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের কয়েকজন ভূঁইয়া (ভৌমিক) বা জমিদার বঙ্গদেশে আকবরের আধিপত্য স্থাপনে বাধা দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ ও প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

আকবর ও চাঁদসুলতানা :—আকবরের সময় দক্ষিণ-ভারতে খান্দেশ, আহ্‌মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর নামে চারিটি মুসলমান রাজ্য ছিল। আকবর উত্তর-ভারত জয় করিয়া দক্ষিণ-ভারতের এই রাজ্যগুলি জয় করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমবারে তাঁহার পুত্র মুরাদ আহ্‌মদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরিত

হইলেন। সেই সময় আহ্‌মদনগরের স্থলতান নাবালক ছিলেন। সেইজন্য চাঁদস্থলতানা তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চাঁদস্থলতানা আহ্‌মদনগরের রাজবংশের



চাঁদস্থলতানা

কন্যা এবং বিজাপুর-স্থলতানের বেগম ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আহ্‌মদনগরে ফিরিয়া আসেন

প্রথমবারে মোগলদের আক্রমণ চাঁদবিবির চেষ্টায় প্রতিহত হয়।

যুবরাজ মুরাদ যখন দেখিলেন যে, আহ্‌মদনগর দখল করা সহজ নহে, তখন তিনি চাঁদসুলতানার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চাঁদসুলতানাও তাহাতে রাজী হইয়া বেরার প্রদেশ মোগলদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। যুবরাজ মুরাদ সন্তুষ্ট হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

দুই বৎসর পরে আহ্‌মদনগরে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। মোগলেরা এই সুযোগে পুনরায় আহ্‌মদনগর আক্রমণ করিল। এই সময়ে চাঁদসুলতানের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং সেই গোলযোগে তিনি প্রাণ হারাইলেন। মোগল-সৈন্যরা এক্ষণে অনায়াসেই আহ্‌মদনগরের রাজধানী দখল করিয়া নাবালক সুলতানকে বন্দী করিলেন। ইহার পর খান্দেশ রাজ্যও অধিকৃত হয়।

আকবর আজীবন যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বিশাল সাম্রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্য কাবুল হইতে বঙ্গদেশ এবং কাশ্মীর হইতে আহমদ্‌নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আকবরের রাজ্যশাসন ঃ—আকবর তাঁহার রাজ্যের সুশাসনের জন্য সমস্ত রাজ্যটিকে পনরটি সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুবার শাসনকর্ত্তাকে সিপাহ্‌সালার (পরবর্ত্তীকালে সুবাদার) বলা হইত। সুবার

রাজস্ব বিভাগ পরিচালনার ভার যাঁহার উপর থাকিত তাঁহাকে দেওয়ান বলা হইত।



আবার প্রত্যেকটি সুবাকে কয়েকটি সরকারে বা জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। সরকারের শাসনকর্ত্তাকে ফৌজদার বলা হইত।

শেরশাহের ন্যায় আকবরও তাঁহার রাজ্যের জমি জরিপ করাইয়াছিলেন। এই জরিপে জমির উৎপাদন-ক্ষমতা অনুসারে জমিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। **উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ** ভূমির কর আদায় করা হইত।

আকবরের পূর্ব্বে সাম্রাজ্যের বড় বড় আমীরেরা বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর পাইতেন। জায়গীরের আয় হইতে তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য রাখিতে হইত। এই জায়গীর-প্রথার অনেক দোষ ছিল। প্রথমতঃ, জায়গীরদারেরা সব সময় তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য রাখিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, জায়গীরদারেরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেন এবং সময় সময় কয়েকজন জায়গীরদার একত্র হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন।

আকবর জায়গীর-প্রথা তুলিয়া দিয়া **মনসবদারী প্রথার প্রবর্ত্তন** করেন। 'মনসব' শব্দের অর্থ 'পদ' বা 'সম্মান'। মনসবের অধিকারীকে মনসবদার বলা হইত। মনসবদারদিগকে তাঁহাদের অধীন সৈন্যসংখ্যা অনুসারে দশহাজারী, পাঁচহাজারী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত এবং সেই অনুসারে বেতন দেওয়া হইত।

আকবরের রাজনীতি ঃ—আকবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে না পারিলে সাম্রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। সেইজন্য তিনি **হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন** করিয়া তাহাদিগকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

র নিজে অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিহারীমলের পৌত্র রাজা মানসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম।

আকবর উপযুক্ত হিন্দু কর্ম্মচারীদের উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। আকবরের পূর্ব্বে অমুসলমানদের নিকট হইতে 'জিজিয়া' নামক কর আদায় করা হইত। ইহাতে হিন্দুরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। আকবর এই কর তুলিয়া দিয়া হিন্দুদের সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।



মানসিংহ

আকবরের ধর্ম্ম-নীতি :—ধর্ম্ম বিষয়ে আকবর উদার ছিলেন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের সকল ধর্ম্মের শাস্ত্রজ্ঞ লোকের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার ফলে বুঝিতে পারিলেন যে, সকল ধর্ম্মের সার এক। সেইজন্য তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। এই নূতন ধর্ম্মের নাম দীন ইলাহী।

আকবরের দরবার :—আকবর নিজে লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার দরবারে গুণী ব্যক্তিরা যথেষ্ট সমাদর পাইতেন। সেই রকম

আকবরের সভায়ও অনেক পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে **আবুল ফজল** সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' দুইটি বিখ্যাত পুস্তক। আবুল ফজলের ভ্রাতা **ফৈজীও** একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। **তানসেন** আকবরের দরবারে



আকবরের সমাধি (সেকেন্দ্রা)

বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁহার মত গায়ক ভারতবর্ষে আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। রাজা **মানসিংহ** ছিলেন আকবরের প্রধান **সেনাপতি**। বড় বড় যুদ্ধে তিনি তাঁহাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করিতেন। রাজা **টোডরমল** আকবরের **রাজস্ব-সচিব** ছিলেন। তিনি আকবরের সাম্রাজ্য জরিপ করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

আর একজন সুরসিক ও সুকবি আকবরের দরবারকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বীরবল।

আকবরের কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঃ—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহাকে সেকেন্দ্রায় সমাহিত করা হয়। বাবুর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তিনি কিংবা তাঁহার পুত্র উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে আকবর মোগল সাম্রাজ্যকে এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া যান যে, পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বংশধরেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও ইহা বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই হিসাবে আকবরকে **মোগল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় এবং প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা** বলা যাইতে পারে।

আকবরের বাণী ঃ—আকবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই দেশ। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে শুধু যে দেশের কেহই সুখে-শান্তিতে থাকিতে পারিবে না, তাহা নহে, দেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন হইবে। বর্ত্তমান ভারতেও এই বাণীর সার্থকতা আছে।

প্রশ্ন

(১) আকবরের সাম্রাজ্য-গঠন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ (মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, প্রেসিডেন্সি—১৯৩৫)। (২) আকবরের রাজ্যশাসনপ্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত কর (মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, প্রেসিডেন্সি—১৯৩৭)। (৩) আকবরের রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যাহা জান বল।

চতুর্থ অধ্যায়

রাণা প্রতাপ ও তাঁহার স্বাধীনতা-সংগ্রাম

প্রতাপসিংহ ছিলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের পৌত্র ও উদয়সিংহের পুত্র। তিনি বীরত্বে তাঁহার পিতামহ সংগ্রাম সিংহের মতই ছিলেন। আকবরের হস্তে পিতা উদয়সিংহের পরাজয়ের গ্লানি তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে অনেক সময়ে বলিতেন, "যদি আমার ও সংগ্রাম সিংহের মধ্যে আর কেহ মেবারের রাণা না হইতেন, তাহা হইলে মেবারের এই দুর্দ্দশা হইত না।" কিন্তু উদয়সিংহ রাজধানী চিতোর হারাইয়াও আকববরের বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

উদয়সিংহের মৃত্যুর পরে প্রতাপসিংহ মেবারের রাণা হইলেন। তাঁহার না আছে রাজধানী, না আছে অর্থ ; অথচ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য তিনি মোগল-সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। রাজপুতানার অন্যান্য অনেক রাজপুত রাজা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, শুধু প্রতাপসিংহ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবেন না, তাঁহার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে না, ইহা আকবর সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম,

তাঁহার স্বাধীন থাকিবার প্রবল স্পৃহা প্রতাপশালী আকবরের নিকট এক মস্ত বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল।

রাজপুতানার ঐতিহাসিকেরা আকবরের মেবার আক্রমণের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, মানসিংহ কোন অভিযান হইতে ফিরিবার সময় প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। মানসিংহের সম্মানার্থে এক ভোজের



হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ

আয়োজন করা হয়। ভোজের সময় অসুস্থতার কারণ দেখাইয়া প্রতাপসিংহ মানসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না। মানসিংহ প্রতাপের অনুপস্থিতির কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি প্রতাপের অনুপস্থিতিতে আহার করিতে রাজী হইলেন না। প্রতাপসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন, যিনি মোগলের সহিত

নিজের ভগিনীর বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহার সহিত তিনি আহার করিতে পারেন না। ইহাতে মানসিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাণা যদি বিপদের মধ্যে থাকিতে চাহেন, থাকুন। আমি যদি তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ না করিতে পারি, আমার নাম মানসিংহ নহে।"

উদ্ধত প্রতাপকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য আকবর এক বিশাল সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। রাজা মানসিংহ ও আসফ খাঁ এই সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। মোগল সেনা-বাহিনী হল্‌দিঘাট নামক গিরিপথের নিকটে আসিলে প্রতাপসিংহ উহাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিলেন। প্রথম আক্রমণে মোগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল; কিন্তু ক্রমে মানসিংহ সৈন্যদিগকে সংযত করিয়া প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করিলেন। অবশেষে রাণার মুষ্টিমেয় সৈন্য মোগলের বিশাল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। রাণাও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আরাবল্লীর বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মোগল সৈন্য প্রতাপসিংহের অনুসরণ করিতে সাহস করিল না।

আরাবল্লীর অরণ্যে থাকিয়া রাণা প্রতাপসিংহ কি করিয়া মোগলদের হাত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবেন, তাহাই চিন্তা কারতে লাগিলেন। আহারে-বিহারে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, বন্য ফলমূল খাইয়া তাঁহার দিন কাটে। তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে মেবারের সমতলভূমি ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। এইবার মেবারের সমতলভূমি প্রায় জনশূন্য হইল।

সুযোগ পাইলেই প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যেরা অরণ্য হইতে বাহির হইয়া অতর্কিতে মোগল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতেন। মোগল সৈন্যেরা ইহাতে বিব্রত হইয়া পড়িল। কালক্রমে মেবারের অধিকাংশ স্থান প্রতাপসিংহ অধিকার করিয়া লইলেন, শুধু অধিকার করিতে পারিলেন না চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড়। ইহার জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার আক্ষেপের অন্ত ছিল না।

পুত্র অমরসিংহ তাঁহার মৃত্যুর পর মেবারকে মোগলের হাতে তুলিয়া দিবেন এই আশঙ্কায় প্রতাপসিংহ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন। যখন মেবারের সর্দ্দারেরা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁহারা কখনও তাহা হইতে দিবেন না, তখন প্রতাপসিংহ শান্তিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রশ্ন

১। আকবরের সহিত প্রতাপসিংহের বিবাদের কারণ উল্লেখ কর।
২। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলার বার ভূঁইয়া

ঈশা খাঁ, কেদার রায়, চাঁদ রায় ও প্রতাপাদিত্য

বাংলার পাঠান সুলতান দায়ুদ আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে মোগলদের পক্ষে আধিপত্য স্থাপন করা অত্যন্ত কষ্টকর হইল। এই সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের বার ভূঁইয়া (ভৌমিক) বলা হইত। প্রকৃতপক্ষে বার ভূঁইয়া বলিতে যে বার জন জমিদারকে বুঝাইত তাহা নহে। জমিদারদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহাদের সমবেতভাবে বার ভূঁইয়া বলা হইত। অসংখ্য নদী-নালা-পরিপূর্ণ পূর্ব্ব-বঙ্গ ও দক্ষিণ-বঙ্গে মোগল অশ্বারোহী সৈন্যদের যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত অসুবিধা হইত। এইজন্য এই অঞ্চলের ভূঁইয়ারা বহুকাল পর্য্যন্ত মোগলশক্তিকে বাধা দিয়া নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের সময় বার ভূঁইয়ারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে বঙ্গদেশে মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই বার ভূঁইয়াদের মধ্যে ঈশা খাঁ, কেদার রায়, চাঁদ রায় ও প্রতাপাদিত্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) ঈশা খাঁ

বার ভূঁইয়াদের মধ্যে সামরিক শক্তিতে ও কূটনীতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ঈশা খাঁ। ঈশা খাঁর জমিদারী বর্ত্তমান ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা ও রঙ্গপুর জেলায় বিস্তৃত ছিল। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' নামক গ্রন্থে তাঁহাকে 'ভাটি' রাজ্যের অধিপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঈশা খাঁর পিতা ছিলেন একজন রাজপুত। তিনি ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার নাম হয় সুলেমান খাঁ। তিনি এক পাঠান রমণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহারই গর্ভে ঈশা খাঁর জন্ম হয়।

ঈশা খাঁ সুযোগ বুঝিয়া মোগল সেনাপতিদের আক্রমণ করিতেন, আবার সুযোগ বুঝিয়া সন্ধি করিয়া নামে মাত্র মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। এইরূপে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত সোনার গাঁ ছিল তাঁহার রাজধানী। ইহা ছাড়া তিনি খিজিরপুর, এগারসিন্ধু, কাত্রাভু প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার রাজ্যকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

বিহার ও উড়িষ্যা হইতে মোগল সেনাবাহিনী দ্বারা বিতাড়িত হইয়া বহু পাঠান সেনানায়ক ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সম্রাট্ আকবর যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহারই এক বিদ্রোহী সেনাপতি মাসুম কাবুলীকে ঈশা খাঁ আশ্রয় দিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। সম্রাটের আদেশ পাইয়া মোগল সেনাপতি সাহবাজ খাঁ মাসুম কাবুলীকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য জেদ করিতে

লাগিলেন। ঈশা খাঁ তাহাতে রাজী না হইলে সাহবাজ খাঁ তাঁহার রাজধানী সোনার গাঁ অধিকার করিয়া লইলেন; কিন্তু মোগলবাহিনীর এই জয় বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কিছুদিন পরেই সাহবাজ খাঁকে ঈশা খাঁর নিকট পরাজিত হইয়া হটিয়া যাইতে হয়। পরে বঙ্গদেশে আরও মোগলসৈন্য আসিলে ঈশা খাঁ বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং সম্রাট্ আকবরের নিকট বহু মূল্যবান্ উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

ঈশা খাঁ বেশীদিন চুপ করিয়া থাকিবার লোক নহেন। তিনি অতঃপর কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কোচবিহারের রাজা আকবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করা হইল। কোচবিহার হইতে ঈশা খাঁ বিতাড়িত হইলেন, কিন্তু এই সময় মানসিংহ অসুস্থ হইয়া পড়ায় নিজে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিলেন না। তিনি স্থলপথে ও জলপথে ঈশা খাঁর কাত্রাভু দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নিজের পুত্র দুর্জ্জন সিংহকে প্রেরণ করিলেন। ঈশা খাঁ ও মাসুম কাবুলী দুর্জ্জন সিংহের নৌ-বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন এবং দুর্জ্জন সিংহ এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। কিন্তু ঈশা খাঁ মোগল বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন ও মোগল সম্রাটের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মানসিংহও অসুখে এবং পুত্রশোকে ভগ্নস্বাস্থ্য ও জর্জ্জরিত হইয়া বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ঈশা খাঁও দেহত্যাগ করেন।

(খ) কেদার রায় ও চাঁদ রায়

কেদার রায় ও চাঁদ রায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল শ্রীপুর। ইহাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহাদের সমসাময়িক আকবরের সভাসদ্ আবুল ফজল রচিত 'আকবর নামা' ইতিহাসে চাঁদ রায়কে কেদার রায়ের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতে মোগলবাহিনীর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া অনেক পাঠান যোদ্ধা দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করে। ইহাদের অনেকেরই সঙ্গে চাঁদ রায় মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত ভূষণার দুর্গের অধিপতি ছিলেন চাঁদ রায়। সুলেমান ও ওসমান নামে দুই জন পাঠান সর্দ্দার এই দুর্গে চাঁদ রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দুর্গে তাহাদের সঙ্গে এক খণ্ড যুদ্ধে চাঁদ রায় নিহত হন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মানসিংহ পুত্রশোকে জর্জ্জরিত ও অসুস্থ হইয়া বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কেদার রায় ও ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁকে দমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। মানসিংহের সৈন্য কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে কেদার রায় বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে কেদার রায় আহত ও বন্দী হইয়া মানসিংহের নিকট আনীত হইলে দেখা গেল, তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা। কিছুক্ষণ

পরেই মানসিংহের সম্মুখেই কেদার রায় তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(গ) প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্যের পিতার নাম শ্রীহরি। শ্রীহরি বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পরে শ্রীহরি দায়ুদ খাঁর ধনরত্নাদি লইয়া বর্ত্তমান খুলনা জেলার দক্ষিণ অংশে অসংখ্য নদী-নালা ও জঙ্গল পরিবৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহা শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য রাজা হইলেন। কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের মত প্রতাপাদিত্যও ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ। বর্ত্তমান যশোহর ও খুলনার জেলার অধিকাংশ স্থান তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধূমঘাট (যশোহরে) ছিল তাঁহার রাজধানী।

প্রতাপাদিত্যের রাজ্য নদী-নালা ও বন-জঙ্গলে এত দুর্ভেদ্য ছিল যে, বহুকাল পর্য্যন্ত মোগলবাহিনী তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই সুযোগে প্রতাপাদিত্য তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। তাঁহার সাত শত যুদ্ধের নৌকা ও বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইস্‌লাম খাঁ বাংলার সুবাদার হইয়া আসিলে প্রতাপাদিত্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে বহু উপঢৌকন দিলেন। এই

সাক্ষাৎকারের সময় স্থির হয় যে, যখন ইসলাম খাঁ বর্ষার শেষে ঈশা খাঁর পুত্রকে দমন করিতে যাইবেন, তখন প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন; কিন্তু কার্য্যকালে প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। ইস্‌লাম খাঁর হস্তে ঈশা খাঁর পুত্র পরাজিত হইবার পর প্রতাপাদিত্যের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, এইবার তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইবে। সেইজন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে ইসলাম খাঁর নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য পাঠাইলেন; কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না।

ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ইনাএৎ খাঁর অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্যসহ এই অভিযানে যোগ দিল। ঠিক সেই সময়ে অপর একদল বাদশাহী সৈন্য প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাক্‌লার জমিদার রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল, যাহাতে রামচন্দ্র তাঁহার শ্বশুরকে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে না পারে। আর একদল সৈন্য পাঠান সর্দ্দার ওসমান খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য প্রেরিত হইল, যাহাতে প্রতাপ তাহার নিকট হইতেও সাহায্য না পাইতে পারে। মোগল সৈন্য যশোহর রাজ্যের সীমানায় পৌঁছিয়া দেখিল যে প্রতাপাদিত্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য সালকা নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মোগলবাহিনীকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার সঙ্গে ছিল প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি জমাল খাঁ ও খোজা কমল। এইস্থানে তুমুল যুদ্ধে খোজা কমল মারা

গেল। উদয়াদিত্যের সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া উদয়াদিত্য রাজধানীর দিকে পলায়ন করিলেন। জমাল খাঁও তাঁহার অনুসরণ করিল। প্রতাপাদিত্য প্রমাদ গণিলেন। সালকার যুদ্ধে তাঁহার বহু সৈন্য ও রণতরী নষ্ট হইয়াছে, তবুও তিনি রাজধানীর নিকটে মোগলবাহিনীকে বাধা দিলেন। অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপাদিত্য ইনাএৎ খার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইনাএৎ খাঁ প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকা রওনা হইলেন। তথায় ইসলাম খাঁ প্রতাপকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন ও তাঁহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

অনুশীলনী

১। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে আকবর তাঁহার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই কেন?

২। ঈশা খাঁ ও প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগলবাহিনীর সংগ্রাম বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাহ্জাহান

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে মেবার দিল্লীর মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে।

জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। শেষজীবনে তাঁহার প্রিয় মহিষী নুরজাহানই এক প্রকার রাজ্যের সব কাজ পরিচালনা করিতেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র খুরম বা শাহ্‌জাহান দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে বিদেশী পর্ত্তুগীজ বণিক ও জলদস্যুরা ভয়ানক উৎপাত করিত। বিশেষতঃ হুগলীর পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারের আর সীমা ছিল না। সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের সুবাদার হুগলী অধিকার করিলেন এবং প্রায় চারিহাজার পর্ত্তুগীজকে আগ্রায় সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে তিনটি মুসলমান রাজ্য ছিল তাহাদের



জাহাঙ্গীর

মধ্যে আহ্‌ম্মদনগর অধিকার করিবার চেষ্টা আকবরের সময় হইতেই চলিতেছিল। আকবর আহ্‌ম্মদনগরের রাজধানী দখল করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর তখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। শাহ্‌জাহান আহমদ্‌নগর রাজ্য জয় করিয়া উহাকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন গোলকুণ্ডার সুলতান শাহ্‌জাহানকে বাৎসরিক কিছু কর দিতে

ও তাঁহার অধীনে থাকিতে রাজী হইলেন। বিজাপুরের সুলতানও শাহ্ জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

জাহাঙ্গীরের সময় **কান্দাহারের দুর্গ** পারস্যের শাহ্ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। শাহ্জাহান যখন ভারতের সম্রাট্ তখন কান্দাহারের এক বিশ্বাসঘাতক পারস্য-সেনাপতি তাঁহার হস্তে দুর্গটি সমর্পণ করেন। কিন্তু পারস্যের শাহ্ পুনরায় দুর্গটি শাহ্জাহানের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। শাহ্জাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব ও দারা তিনবার চেষ্টা করিয়াও ঐ দুর্গটি দখল করিতে পারিলেন না।

সিংহাসনের জন্য গৃহবিবাদঃ—শাহ্জাহানের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সব সময়ে সম্রাটের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার রাজকার্য্যে সহায়তা করিতেন দারা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককে সমান ভালবাসিতেন দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা। তিনি যোদ্ধা হইলেও অত্যন্ত বিলাস-প্রিয় ছিলেন। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা। শাহ্জাহানের পুত্রদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। শাহ্জাহানের সর্ব্বকনিষ্ঠ


শাহ্জাহান

পুত্র মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মুরাদ বীরপুরুষ হইলেও আওরঙ্গজেবের মত বুদ্ধিমান্ ছিলেন না। এই চারি পুত্র ব্যতীত শাহ্‌জাহানের দুই কন্যাও ছিল। তাঁহাদের একজনের নাম জাহানারা, অপরের নাম রোশ্‌নারা।

এক সময় সম্রাটের ভয়ানক পীড়া হয়। আগ্রায় জনরব উঠিল যে, সম্রাট্ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জনসাধারণের এই ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য শাহ্‌জাহান তাঁহার অসুস্থ শরীর লইয়াও প্রাসাদের জানালায় দাঁড়াইয়া প্রজাদিগকে দেখা দিলেন। কিন্তু এই সংবাদ আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বিশ্বাস করিলেন না। রাজধানী হইতে সম্রাটের মঙ্গল-সংবাদ পৌঁছিলেও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, সম্রাট্ তখনও জীবিত। বঙ্গদেশ হইতে সুজা আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ দিক্ হইতে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনী রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দারা তাঁহাদের বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এইরূপে বৃদ্ধ শাহ্‌জাহানের চারি পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এই যুদ্ধের ফলে সুজা পরাজিত হইয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দারা বন্দী হইয়া কাজীর বিচারে খাতকের হাতে প্রাণ হারাইলেন। আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করিবার অপরাধে মুরাদ বন্দী হইলেন এবং তিন বৎসর পরে নরহত্যার অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহ্‌জাহান আগ্রার দুর্গে বন্দী হইয়া রহিলেন এবং আওরঙ্গজেব 'আলমগীর' নাম ধারণপূর্ব্বক

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই আগ্রার দুর্গেই অতঃপর সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের দুঃখময় জীবনের অবসান হয়।

শাহজাহানের জাঁকজমক—শাহ্‌জাহান জাঁকজমক ভালবাসিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মস্‌জিদ ও স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেগুলি এখনও দর্শকদের মনকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তাঁহার **ময়ূরসিংহাসন** এখন দেখিতে না পাওয়া গেলেও তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা তখনকার ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। এই সিংহাসন তৈয়ারী করিতে বহু মণিমাণিক্য ও এক লক্ষ তোলা সোনা লাগিয়াছিল। তখনকার দিনে এক লক্ষ তোলা সোনার দাম ছিল চৌদ্দ লক্ষ টাকা, আর যে সকল মণিমাণিক্য দেওয়া হইয়াছিল তাহার দাম ছিল ছিয়াশি লক্ষ টাকা। সিংহাসনের চারিদিকে বারোটি থাম ও থামের উপর মণিমাণিক্যখচিত চাঁদোয়া ছিল। বারোটি থামের প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া ময়ূর শোভা পাইত। নানা রঙের মণিমাণিক্য বসাইয়া ময়ূরগুলির গায়ের ও পেখমের রঙ্‌ ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল। এই ময়ূর হইতে সিংহাসনটির নাম ময়ূরসিংহাসন হয়

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল আগ্রা। শাহ্‌জাহান তাঁহার রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিলেন। দিল্লীতে এক শহর তৈয়ারী করিয়া তাহার নাম রাখিলেন শাহ্‌জাহনাবাদ। এইখানে একটি সুবৃহৎ দুর্গও নির্ম্মিত হইল। এই দুর্গ এখন "লাল কেল্লা"

নামে পরিচিত। দুর্গের ভিতর অনেক সুন্দর মহল বা প্রাসাদ ছিল। ইহাদের মধ্যে রঙ্গ-মহল, দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস অতিশয় মনোরম ছিল। রঙ্গমহলে থাকিতেন রাণীরা। দেওয়ান-ই-আমে বসিয়া সম্রাট প্রজাদের আবেদন-নিবেদন শুনিতেন, আর দেওয়ান-ই-খাসে প্রধান প্রধান অমাত্যদের সহিত রাজকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। দেওয়ান-ই-খাসই ছিল সবচেয়ে সেরা মহল। এই মহলের দেওয়ালে লেখা আছে—"যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তাহা এইখানেই আছে।"

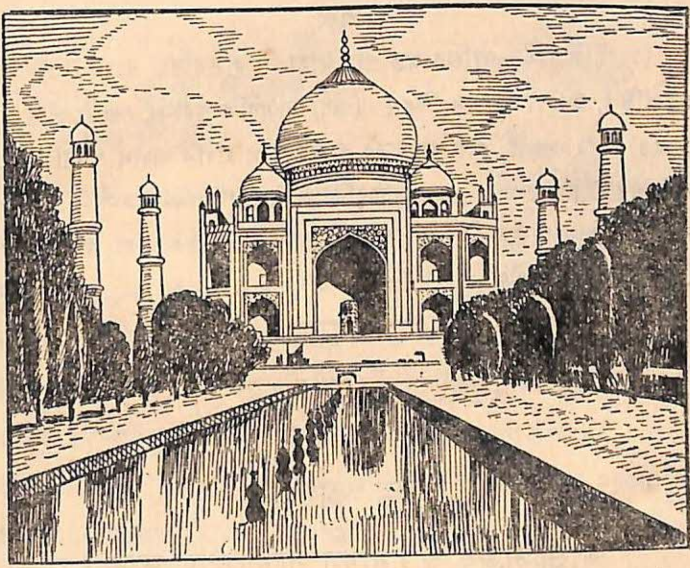


মমতাজ

এই দুর্গের সম্মুখেই উঁচু জমির উপর শাহ্‌জাহান এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মস্‌জিদের নাম জাম-ই-মস্‌জিদ (জুম্মা মস্‌জিদ)। এত বড় মস্‌জিদ ভারতবর্ষে আর একটিও নাই। এই মস্‌জিদ তৈয়ারী করিতে ছয় বৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং খরচ হইয়াছিল দশ লক্ষ টাকা।

শাহ্‌জাহান রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিলেও তাঁহার রাজত্বের এবং সমগ্র পৃথিবীর সেরা সৌধটি তৈয়ারী হইয়াছিল আগ্রায়। ইহার নাম তাজমহল। শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের সমাধির উপর এই স্মৃতি-সৌধটি

নির্ম্মিত হয়। মুকরমত খাঁ ও মীর আব্দুল করিম কর্ত্তৃক তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিচালিত হয় এবং ওস্তাদ ইসা ছিলেন ইহার প্রধান স্থপতি। তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে সময় লাগিয়াছিল বাইশ বৎসর, আর খরচ হইয়াছিল বহু লক্ষ



তাজমহল

টাকা। শ্বেত পাথরে তৈয়ারী তাজমহল জগতের এক আশ্চর্য্য দৃশ্য।

আগ্রার দুর্গ আকবরের তৈয়ারী হইলেও তাহার ভিতর মতি-মস্‌জিদটি তৈয়ারী করিয়াছিলেন শাহ্‌জাহান। এই দুর্গের ভিতর শাহ্‌জাহানের আর একটি কীর্ত্তি আছে। তাহা মুসাম্মন বুরুজ নামে একটি মহল। ইহার কারুকার্য্য অতি অপূর্ব্ব।

পুত্রহস্তে বন্দী হইয়া শাহ্‌জাহান তাঁহার শেষ জীবন এইখানে অতিবাহিত করিতেন। এইখান হইতেই মুমূর্ষু শাহ্‌জাহান তাজমহলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তাঁহার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন

(১) সিংহাসন-প্রাপ্তির জন্য শাহ্‌জাহানের পুত্রগণের মধ্যে যে বিবাদ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখ। (মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, প্রেসিডেন্সি—১৯৩৪)। (২) সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সবিশেষ উল্লেখ কর। (মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, বর্দ্ধমান—১৯৩২)। (৩) সম্রাট্ শাহ্‌জাহানকে ইতিহাসে আড়ম্বরপ্রিয় নরপতি বলা হয় কেন? (মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, বর্দ্ধমান—১৯৩৪)।

সপ্তম অধ্যায়

আওরঙ্গজেব ও মোগল সাম্রাজ্যের পতন

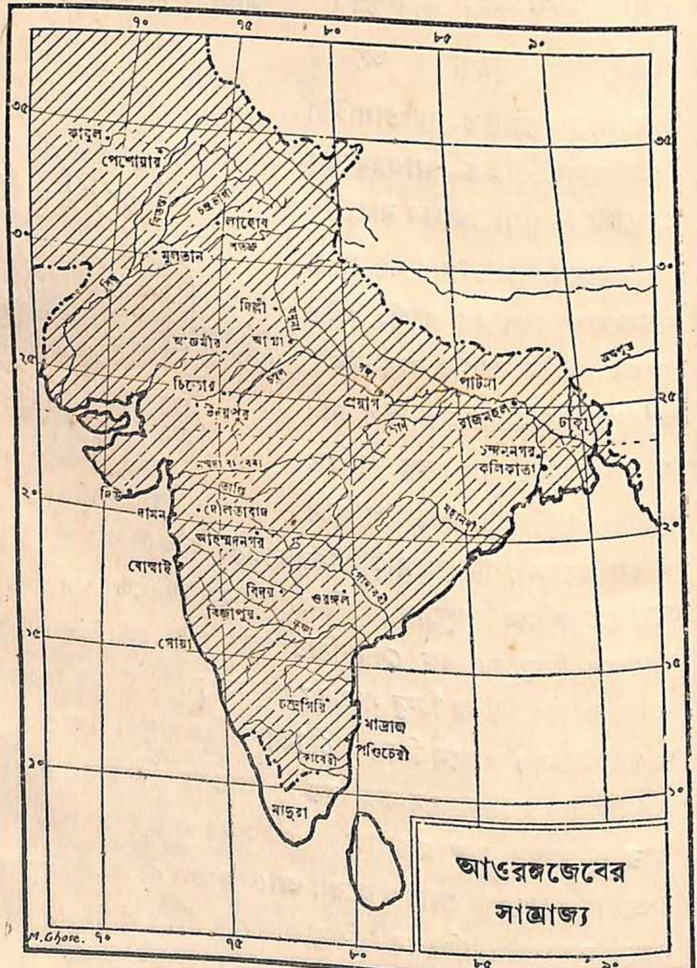
আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মনীতি ও সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ—সম্রাট শাহ্‌জাহানকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করিয়া আওরঙ্গজেব 'আলমগীর' নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর নিকটবর্ত্তী এক উদ্যানে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার মহাসমারোহে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আওরঙ্গজেবের ন্যায় বুদ্ধিমান্, রণকুশল ও ধার্ম্মিক নরপতি ভারতের ইতিহাসে বিরল।

স্বধর্ম্মে সম্রাটের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সমগ্র কোরআন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং কোরআনের নির্দ্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মোগল সম্রাট্‌দের মধ্যে অনেকে বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব মোটেই বিলাসী ছিলেন না।


আওরঙ্গজেব

স্বধর্ম্মে সম্রাটের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও অপরের ধর্ম্মের প্রতি আকবরের যে প্রকার শ্রদ্ধা ছিল, আওরঙ্গজেবের তদ্রূপ ছিল না। আকবর জিজিয়া কর রহিত করিয়া হিন্দুদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুদের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে হিন্দুদের বহু দেবমন্দির ধ্বংস করা হইয়াছিল। এই সকল কারণে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল মথুরার জাঠেরা। এই বিদ্রোহ সহজে দমন করা হয়। তারপর বিদ্রোহ ঘোষণা করে বুন্দেলার রাজা ছত্রসাল। এই সময় পাঞ্জাবের সৎনামী সম্প্রদায়ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আওরঙ্গজেব এই সকল বিদ্রোহ সহজে দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুত, শিখ ও মারাঠাদের বিদ্রোহ সম্রাট্‌কে বিশেষ·ভাবে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর **পঞ্চম** শিখগুরু অর্জ্জুনকে নিহত করিয়াছিলেন। তাহাতে শিখেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।



আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য

কিন্তু **নবম গুরু তেগ বাহাদুর** আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিহত হইলে শিখেরা আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা **দশম গুরু গোবিন্দসিংহের নেতৃত্বে** মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে **অস্ত্রধারণ** করিল।

আকবরের সদয় ব্যবহারে রাজপুতেরা ক্রমশঃ মোগল সম্রাট্দের বশ্যতা স্বীকার করিতেছিল। শাহ্জাহানের রাজত্বকালে রাজপুত রাজারা মোগল সম্রাটের সম্পূর্ণ বাধ্য ছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজপুত রাজাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে **বিদ্রোহ** ঘোষণা করেন।

মাড়োয়ারের রাজপুত রাজা যশোবন্তসিংহ আওরঙ্গজেবের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে আওরঙ্গজেব তাঁহার নাবালক পুত্রকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন। সেই সময়ে যশোবন্তের বিধবা স্ত্রী ও নাবালক পুত্র দিল্লীতে ছিলেন। তাঁহারা যাহাতে পলায়ন করিতে না পারেন, তজ্জন্য আওরঙ্গজেব তাঁহাদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করেন। যশোবন্তসিংহের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন; তাঁহার নাম দুর্গাদাস। এই বিপদে দুর্গাদাস যশোবন্ত সিংহের বিধবা স্ত্রীকে পুরুষের পোশাক পরাইয়া ও শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রহরীর বেষ্টন ভেদ করিয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা মাড়োয়ার ছাইয়া ফেলিল। দুর্গাদাস বিক্রমের সহিত মোগলদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি মোগলদিগকে আক্রমণ করিতেন।

মেবারের রাণা রাজসিংহও বেশী দিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যশোবন্তের বিধবা স্ত্রী মেবারের রাজবংশেরই কন্যা ছিলেন। তিনি এই বিপদের সময় রাণা রাজসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মোগলসৈন্যেরা মাড়োয়ারে অনেক অত্যাচার করায় রাণা রাজসিংহও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজসিংহ মাড়োয়ারের বিধবা রাণীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া যুদ্ধে যোগদান করিলেন।

মোগলসৈন্যেরা মেবার আক্রমণ করিল। রাজসিংহ মোগলদিগকে বাধা দিতে পারিলেন না। তিনিও রাণা প্রতাপ-সিংহের ন্যায় পাহাড়-পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। সুযোগ পাইলে সেখান হইতেই তিনি মোগলসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতেন। এই প্রকারে অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। অবশেষে রাণা রাজসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের এক সন্ধি হয়; কিন্তু আওরঙ্গজেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি মাড়োয়ারের বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই।

দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ ঃ—দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের প্রধান শত্রু ছিল মারাঠা জাতি। মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর শিবাজী এই জাতিকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিতেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহাকে ছলে-বলে কৌশলে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই। শিবাজীর মৃত্যু হইলে

আওরঙ্গজেব মেবারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া এবং মাড়োয়ারের বিদ্রোহ দমনের ভার সেনাপতিদের হাতে দিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করিলেন। অনেক যুদ্ধের পর তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয় লইলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও মারাঠা জাতিকে দমন করিতে পারিলেন না। সম্রাট্ তাঁহার জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যের রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ—আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অনেক কারণ আছে।

আওরঙ্গজেবের সময় মোগল সাম্রাজ্যের সীমা অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ভাল রাজপথাদিদ্বারা সংযুক্ত ছিল না। সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে কেহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে রাজধানী হইতে সত্বর সৈন্য প্রেরণ করা যাইত না। আওরঙ্গজেব নিজে এই অসুবিধা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্রাটের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিত। বাবুর হইতে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটেরা ক্ষমতাশালী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে সকল মোগল সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ক্ষমতাশালী ছিলেন না। উপরন্তু তাঁহারা গৃহ-বিবাদে লিপ্ত থাকায় দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন।

আকবর তাঁহার উদার নীতিদ্বারা হিন্দুদের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব হিন্দু ও শিখদের ধর্ম্মের অবমাননা করাতে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অনেক বিদ্রোহ দমন করিলেও অনবরত যুদ্ধ এবং বহু অর্থব্যয় করিয়াও আওরঙ্গজেব রাজপুত ও মারাঠাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। এই দুই বিখ্যাত হিন্দু যোদ্ধৃজাতির বিদ্রোহের ফলে মোগল সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আওরঙ্গ-জেবের মৃত্যুর পরও মোগল সাম্রাজ্যের যাহা কিছু গৌরব ছিল তাহাও পারস্য দেশের রাজা **নাদিরশাহের আক্রমণে** লুপ্ত হইয়া যায়।

প্রশ্ন

(১) রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন কেন? (২) আকবরের নীতির সহিত আওরঙ্গজেবের নীতির তুলনা কর। (৩) মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি। (মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, প্রেসিডেন্সী—১৯৩১)।

কালরেখা
আকবর হইতে আওরঙ্গজেব

খৃষ্টাব্দ

১৫৫৬.. আকবরের রাজ্যলাভ ও পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
১৫৬০.. বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি

১৫৭৬.. হলদিঘাটের যুদ্ধ

১৬০০.. আহম্মদনগরের পতন
১৬০৫.. আকবরের মৃত্যু

১৬২৭.. শাহ্‌জাহানের সিংহাসনে আরোহণ

১৬৫৮.. আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণ

১৬৮০.. শিবাজীর মৃত্যু

১৭০৭.. আওরঙ্গজেবের মৃত্যু

স্কেল
১ ইঞ্চি = ৩০ বৎসর

অষ্টম অধ্যায়

শিবাজী ও মারাঠা শক্তির উত্থান

শিবাজী ঃ—শাহ্‌জাহান যে বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই বৎসর মহারাষ্ট্র দেশে শিবনের দুর্গে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। শিবাজীর পিতার নাম শাহজী এবং মাতার নাম জীজাবাই। শাহজী প্রথমে আহ্‌মদনগরের রাজ-সরকারে চাকুরী করিতেন। শাহ্‌জাহান কর্ত্তৃক আহ্‌মদনগর অধিকৃত হইলে শাহজী বিজাপুরের সুলতানের সেনাপতি হইলেন। শিবাজীর জন্মের পর তাঁহার পিতা অন্য এক রমণীকে বিবাহ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে থাকেন। শিবাজী ও তাঁহার মাতা শাহজীর জায়গীর পুনাতে বাস করিতে থাকেন।



শিবাজী

এই সময় দাদাজী কোণ্ডদেব নামে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শিবাজীর অভিভাবক ছিলেন। শিবাজী বাল্যকালে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখেন নাই। তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় ঘোড়দৌড়, কুস্তি, লড়াই প্রভৃতিতে অতিবাহিত হইত। এই সময় তিনি মহারাষ্ট্র দেশের কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ লোক লইয়া একটি দল গঠন করেন। দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর পর শিবাজী তাঁহার সৈন্যদল লইয়া দুর্গের পর দুর্গ দখল করিতে লাগিলেন।

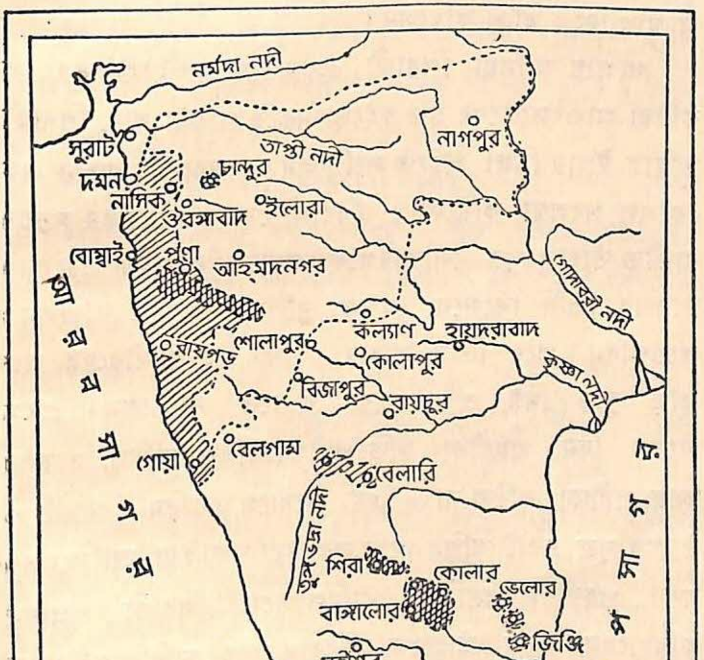
শিবাজী ও আফজল খাঁ :—বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করিলেন। শিবাজী তখন তাঁহার দুর্গ প্রতাপগড়ে ছিলেন। আফজল খাঁ শিবাজীকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। শিবাজী তাহাতে সম্মত হইলেন; কিন্তু আফজল খাঁকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাই তিনি দুর্গ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে 'বাঘনখ' নামক একটি অস্ত্র সঙ্গে লইলেন। সাক্ষাৎকারের সময় আফজল খাঁর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া শিবাজী 'বাখনখ' বাহির করিয়া আফজল খাঁর পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এইভাবে আফজল খাঁ শিবাজী-কর্ত্তৃক নিহত হন। সেনাপতির মৃত্যুতে বিজাপুরের সৈন্যেরা কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না; এমন সময় শিবাজী তাঁহার সৈন্য লইয়া আফজল খাঁর সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। তখন তাহারা ভয়ে পালাইয়া গেল

আওরঙ্গজেব ও শিবাজী ঃ—ইহার পর শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিলেন। ইহাতে আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁ পুনায় আসিয়া যে গৃহে শবাজী তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

বিশাল মোগলবাহিনীকে পরাজিত করা শিবাজীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। শিবাজী তাঁহার কতকগুলি বিশ্বস্ত ও সাহসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া পুনার দিকে যাত্রা করিলেন। শায়েস্তা খাঁর বাড়ীর চারিদিকে মোগল-শিবির। সন্ধ্যার সময় শিবাজী মোগল-শিবিরের সীমানায় পৌঁছিলেন। তিনি মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কোন গোপনীয় স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁর বাড়ীর সমস্ত লোকজন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মোগল-শিবিরে কয়েকজন প্রহরী ব্যতীত আর কেহই জাগিয়া নাই, এমন সময় শিবাজী তাঁহার অনুচরদিগকে লইয়া শায়েস্তা খাঁর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শিবাজীর তরবারির আঘাতে একটি আঙ্গুল হারাইয়া শায়েস্তা খাঁ কোন রকমে পলায়ন করিলেন। এই সংবাদ আওরঙ্গজেবের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। অতঃপর সম্রাট্ শায়েস্তা খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ইহার পর শিবাজীর সাহস আরও বাড়িয়া গেল এবং তিনি

সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। আওরঙ্গজেব এইবার শিবাজীকে দমন করিবার জন্য জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলেন। এইবার



আত্মসমর্পণ ব্যতীত শিবাজীর পক্ষে আর কোন উপায় রহিল না। অবশেষে তিনি জয়সিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন।

আগ্রায় আসিয়া শিবাজী প্রকৃতপক্ষে বন্দী হইলেন। কি করিয়া আওরঙ্গজেবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, শিবাজী তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। শিবাজী কেবল কয়েকজন অনুচর ব্যতীত তাঁহার অন্য লোকদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর তিনি নিজেকে অসুস্থ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি ব্রাহ্মণ, ফকির ও আমীরদের জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্ট দ্রব্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েক দিন প্রহরীরা ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তারপর আর পরীক্ষা করিল না। এই সুযোগে একদিন শিবাজী ও তাঁহার পুত্র একটি ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া পলাইয়া আসিলেন। যখন পহরীরা জানিতে পারিল যে, শিবাজী পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করা হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শিবাজী ছদ্মবেশে বহু হিন্দুতীর্থ দর্শন করিয়া পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া শিবাজী দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্ত্তার সহিত কিছু দিনের জন্য এক সন্ধি করিলেন। এই সময়ে শিবাজী নিজেকে শক্তিশালী করিয়া পুনরায় মোগলের সঙ্গে

যুদ্ধে রত হইলেন এবং দ্বিতীয় বার সুরাট লুণ্ঠন করিলেন। অতঃপর রায়গড় দুর্গে শিবাজীর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক' এই দুই উপাধি ধারণ করিয়া নিজেকে মহারাষ্ট্র দেশের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে রায়গড দুর্গে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

শিবাজীর পরবর্ত্তী মারাঠা রাজ্যঃ—শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা জাতিকে দমন করিবার জন্য সম্রাট্ আওরঙ্গজেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসেন। কিন্তু পঁচিশ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টার পরও তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না।

শিবাজী মারাঠা জাতির মধ্যে যে প্রেরণা দিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরও মারাঠা জাতির শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিবাজীর পৌত্র শাহুর রাজত্বকালে **পেশোয়া** উপাধিধারী মন্ত্রী বালাজি বিশ্বনাথ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। বালাজি বিশ্বনাথের পর হইতে পেশোয়া-পদ বংশগত হইয়া পড়ে। পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠারা ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। পরে ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মারাঠা সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

প্রশ্ন

শিবাজীর বাল্যজীবন অতি সংক্ষেপে লিখ (মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, প্রেসিডেন্সী—১৯৩৩)। (২) শিবাজীর সহিত আওরঙ্গজেবের সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণনা কর (মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, বর্দ্ধমান—১৯৩৭)।

নবম অধ্যায়

মোগল-যুগে জীবনযাত্রা

নানা শ্রেণীর লোকের অবস্থা ঃ—মোগল-যুগে ভারতে ঐশ্বর্য্যের অন্ত ছিল না; কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মোগল বাদশাহ্ ও তাঁহার আমীরেরা বিলাসিতায় ও উৎসবাদিতে যখন অজস্র অর্থব্যয় করিতেন, তখন দেশের জনসাধারণ অতি কায়ক্লেশে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আকবরের সভাসদ্ আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাটের জন্য প্রত্যেক বৎসর মণিমাণিক্য খচিত এক হাজার পোশাক প্রস্তুত করা হইত। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ড হইতে আগত 'হকিন্স' নামক জনৈক ইংরেজ রাজদূতের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বাদশাহ্ ও তাঁহার আমীরদের মধ্যে অনেকেই বহুমূল্য মণিমুক্তা খচিত পালঙ্কে রেশমের বিছানায় নিদ্রা যাইতেন। আমীরেরা তাঁহাদের বাড়ীর ভোজাদিতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। সুদূর সমরকন্দ ও বোখারা হইতে তাঁহাদের জন্য মূল্যবান সুস্বাদু ফল আনা হইত। বরফের প্রচলন তখন খুব বেশী না হইলেও আমীরেরা প্রায় সারা বৎসরই বরফ ব্যবহার করিতেন। আমীরদের মৃত্যুর পরে তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইত বলিয়া আমীরেরা জীবিতাবস্থায় বিলাসব্যসনে তাঁহাদের সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়া দিতেন।

নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী, দোকানদার ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থা মোটের উপর সচ্ছল ছিল। দ্রব্যাদির দুমূল্যতা না ঘটিলে তাহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বিশেষ কষ্ট হইত না। দোকানদারদের হাতে নেহাৎ কম অর্থ থাকিত না। কিন্তু লোভী ও উৎপীড়ক রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের যে অর্থ আছে তাহা যাহাতে না জানিতে পারে সেজন্য তাহারা অনেক সময় অতি সাধারণ জামা-কাপড় পরিধান করিয়া থাকিত।

ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদের তুলনায় দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। শেরশাহ ও আকবরের সময় কৃষকেরা মোটের উপর সুখে ছিল, তাহাদের উপর রাজ-কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিতে পারিত না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাহাদের উপর প্রদেশিক শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছিল। জাহাঙ্গীরের সময় 'ফ্রান্সিস্কো পেলসার্ট' নামক জনৈক ওলন্দাজ বণিক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কৃষকেরা স্থানীয় শাসন-কর্ত্তা ও রাজস্ব আদায়কারীদের অত্যাচারে দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছিল। কৃষকদের চেয়ে মজুরদের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। রাজপুরুষেরা প্রয়োজন হইলে রাস্তা হইতে মিস্ত্রী ও মজুরদের জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেন এবং সমস্ত দিন খাটাইয়া অর্দ্ধেক মজুরি দিয়া কিংবা কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দিতেন। ইহাদের দুই বেলা ভাল করিয়া আহারও জুটিত না, সকাল বেলা খিচুরী ও রাত্রিতে ছোলা-ভাজা

খাইয়া জীবন কাটাইয়া দিত। রাজপুরুষদের অত্যাচার হইতে দোকানদারেরাও রেহাই পাইত না। ইহাদের নিকট দোকানদারদের অর্দ্ধেকের চেয়েও কম মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিতে হইত। মোগলযুগে ছোট-বড় প্রত্যেক আমীরের অনেক চাকর থাকিত। ইহাদের অবস্থা মজুরদের অবস্থার চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না। মজুর কিংবা ভৃত্যদের বেতন অত্যন্ত কম হইলেও কায়ক্লেশে তাহাদের দিন চলিয়া যাইত। কারণ, তখন জিনিসের দাম অত্যন্ত কম ছিল।

শাহ্‌জাহানের সময় হইতে কৃষকদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহা চরমে উঠে আওরঙ্গজেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী মোগল সম্রাট্‌দের সময়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সম্রাট্‌দের ক্ষমতা শিথিল হইলে নানা স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। তাহাতে রাজপথ দিয়া চলাচল করা নিরাপদ ছিল না। আওরঙ্গজেবের সময় হইতে আমীরদেরও অধঃপতন ঘটিতে থাকে। বিলাসিতায় এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় তাঁহাদেরও কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস পায়। তবে মোগল যুগে সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসবাদিতে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংযোগ ছিল।

অনুশীলনী

১। মোগল যুগে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকদের অবস্থা বর্ণনা কর।

২। মোগলযুগে দরিদ্রের আয় অত্যন্ত কম হইলেও কি প্রকারে তাহাদের পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভবপর হইত ?

দশম অধ্যায়

ইউরোপীয় বণিকগণ—বাংলার বয়নশিল্প

প্রাচীনকালে ভারতের ঐশ্বর্য্যের সুখ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপের বাজারে ভারতের পণ্য-দ্রব্যের খুব চাহিদা ছিল। এই সকল পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরে আনীত হইত এবং সেখান হইতে ইউরোপে রপ্তানী করা হইত।

কালক্রমে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী এশিয়ার দেশসমূহ তুর্কী জাতীয় মুসলমান-দের হস্তগত হইলে এই পথে ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইল না। সেজন্য ইউরোপের বণিকেরা ভারতে আসিবার অন্য পথের সন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে পর্ত্তুগালের রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভাস্কো-দা-গামা নামে এক নাবিক আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা ইউরোপের অন্য দেশের বণিকদিগকে এই পথে আসিয়া বাণিজ্য করিতে দিত না। এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য তাহাদের একচেটিয়া ছিল।



ভাস্কো-দা-গামা

ভারতে পর্ত্তুগীজ বণিকদের একচেটিয়া ব্যবসায়ে বাদ সাধিল ইংরেজ ও ওলন্দাজ* বণিকেরা। আকবরের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একদল ইংরেজ বণিক 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি বণিকসঙ্ঘ গঠন করিয়া তাহাদের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ভারতে একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার জন্য অনুমতি লাভ করে। তাহাদের দেখাদেখি ওলন্দাজেরা ও ভারতে বাণিজ্য



রাণী এলিজাবেথ

করিতে আসে। অবশেষে ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায় লইয়া পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকেরা যুদ্ধাদিতে লিপ্ত হয়। পর্ত্তুগীজ বণিকেরা এই দেশের লোকদের উপর অত্যাচার করিত বলিয়া এই দেশের লোকেরা তাহাদের পছন্দ করিত না। সুতরাং নবাগত ইউরোপীয় বণিক ও ভারতবর্ষের লোকদের প্রতিকূলতায় পর্ত্তুগীজ বণিকদের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইল। ওলন্দাজ বণিকেরা ভারতবর্ষের চেয়েও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে

* হল্যাণ্ডের অধিবাসীকে ওলন্দাজ বলা হয়

বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা সেখান হইতে পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজদের বিতাড়িত করিয়া জাঁকিয়া বসিল। ইংরেজেরা কালক্রমে ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইয়া এদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

ভারতে ইংরেজেরা নানা স্থানে কুঠি স্থাপন করিল। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা দিল্লীর সম্রাট্ বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনেক সুবিধা আদায় করিয়া লইত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দরে ইংরেজদের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে 'ফ্রেন্সিস্ ডে' নামক জনৈক ইংরেজ চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে করমণ্ডল উপকূলে সামান্য জায়গা ইজারা লইলেন। এইস্থানে ইংরেজেরা একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে। এই দুর্গটির নাম রাখা হয় 'সেন্ট-জর্জ্জ'। এই দুর্গের আশেপাশে মাদ্রাজ শহর গড়িয়া উঠে। সুরাটে কুঠি স্থাপন করিবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে ইংল্যাণ্ডের রাজা বোম্বাই দ্বীপটি মাত্র আশি টাকায় ইংরেজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইজারা দেন। কালক্রমে এইখানে বোম্বাই শহর গড়িয়া উঠে। শাহ্জাহানের রাজত্বকালে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসে। প্রথমে তাহারা হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 'জব চার্ণক' নামে কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী ভাগীরথীর তীরে গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সূতানুটি নামে তিনটি গ্রাম ক্রয় করিয়া কলিকাতায় একটি কুঠি স্থাপন করেন। পরে এইখানে একটি দুর্গও নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গের নাম 'ফোর্ট উইলিয়ম'।

কালক্রমে এই দুর্গের নিকট কলিকাতা শহর গড়িয়া উঠে। এই কলিকাতাই পরবর্ত্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়।

ইংরেজদের বেশীদিন নির্ব্বিবাদে ব্যবসায় করা চলিল না। ইউরোপের ফ্রান্স দেশের বণিকেরাও ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য এক বণিক-সঙ্ঘ গঠন করিল। অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের ন্যায় তাহারাও ভারতের নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। ভারতে তাহাদের প্রধান কুঠি ছিল পণ্ডিচেরীতে ও বঙ্গদেশের চন্দননগরে।

প্রথমে ব্যবসায় লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। ক্রমে উভয় জাতির বণিকেরা বুঝিতে পারিল যে ভারতে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। আর মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের জন্য সেই সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা লইয়া এই উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধাদি আরম্ভ হইল। ইউরোপে উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধের সংবাদ এই দেশে পৌঁছিলে এই দেশেও উভয় জাতির বণিক-সম্প্রদায়ের



ক্লাইভ

মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। আর ইউরোপে শান্তি বজায় থাকিলেও এই দেশে তাহারা বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিত। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের যেন আর বিরাম ছিল না। যুদ্ধ উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতেই বেশী হইয়াছিল, আর এই যুদ্ধে দুই পক্ষের দুই জন যোদ্ধাও বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ডুপ্লে। তিনি ছিলেন ভারতে ফরাসী শাসনকর্ত্তা। আর এক জনের নাম ক্লাইভ। তিনি ছিলেন ইংরেজ সেনাপতি। ইংরেজ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের পতন হইল। তাহারা ব্যবসায়েও সুবিধা করিতে পারিল না, আর ভারতে রাজশক্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। অপর পক্ষে ইংরেজদের শুধু যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের বয়ন-শিল্পই ইউরোপীয় বণিকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশের বস্ত্র-শিল্পের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে 'রাল্‌ফ্‌ ফিচ্' নামে ইংল্যাণ্ডের একজন ভ্রমণকারী পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বয়ন-শিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ারী হয়, সেরূপ ভারতের আর কোথাও হয় না। ঢাকার মস্‌লিন সভ্য জগতের সর্ব্বত্র ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হইত। ইউরোপের সর্ব্বত্র বঙ্গদেশের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের খুব বেশী চাহিদা ছিল।

এই বস্ত্র বেশী পরিমাণে কিনিবার জন্য ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এই সকল কাপড় ইউরোপীয় বণিকেরা ইউরোপে প্রেরণ করিত এবং তাহার পরিবর্ত্তে ইউরোপ হইতে আসিত প্রচুর সোনা ও রূপা। এইরূপে বয়নশিল্পের দ্বারা বঙ্গদেশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে ইংরেজ কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই দেশের বস্ত্রশিল্পের অবনতি ঘটিতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা দেশীয় তাঁতিদের কাপড় বুনিয়া দিবার জন্য অগ্রিম টাকা লইতে বাধ্য করিত। এই অগ্রিম টাকাকে 'দাদন' বলা হইত। তাঁতিরা যে কাপড় বুনিয়া দিত তাহার জন্য তাহাদের ইংরেজ কোম্পানী অত্যন্ত কম দাম দিত। 'দাদান' লইতে কিংবা কাপড় বুনিতে তাঁতিরা রাজী না হইলে তাহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করা হইত। এই অত্যাচারের প্রতিকারের ক্ষমতা বাংলার নাম-সর্ব্বস্ব নবাবদের ছিল না। এই অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য তাঁতিরা নিজেদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিত। বৃদ্ধাঙ্গুলি না থাকিলে কাপড় বোনা যায় না; সুতরাং আঙ্গুল-কাটা তাঁতিরা এই সকল অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইত। অপর দিকে বঙ্গদেশের কাপড়ের প্রতিযোগিতায় যাহাতে ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র-শিল্প নষ্ট না হইয়া যায় সেজন্য ইংল্যাণ্ডের সরকার তাহাদের দেশে ভারতের কাপড় ব্যবহার করা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা কমিয়া গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে কলে কাপড় প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই কলে বোনা

সস্তা দামের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বঙ্গদেশের তাঁতিরা পারিয়া উঠিল না। এইরূপে বাংলার বস্ত্রশিল্প নষ্ট হইয়া যায়।

অনুশীলনী

১। ইউরোপ হইতে আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কারের কি প্রয়োজনীয়তা ছিল?

২। ভারতে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল? তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে জয়ী হইয়াছিল?

৩। বঙ্গদেশের বস্ত্র-শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবার কারণ কি?

একাদশ অধ্যায়

সিরাজউদ্দৌলা—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মোগল সাম্রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। সেই সুযোগে বাংলার শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলী খাঁ নামে মাত্র মোগল সম্রাটের অধীন থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও বিলাসী নবাব ছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বঙ্গদেশের নবাব হইলেন।

আলিবর্দ্দীর তিন কন্যা ছিল, কিন্তু কোন পুত্র ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজউদ্দৌলাকে আলিবর্দ্দী খুবই ভালবাসিতেন। আলিবর্দ্দী তাঁহার জীবিত

কালে সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের নিকট রাজস্বের হিসাব-নিকাশ তলব করিলে রাজবল্লভ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ সমেত তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিলেন। নবাব কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে আদেশ দিলে ইংরেজেরা তাহাতে অস্বীকৃত হয়। এইরূপে ইংরেজদের সহিত নবাবের মনোমালিন্য ঘটে। এই মনোমালিন্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।



মুর্শিদকুলী খাঁ।

ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদ বাধিলে চন্দননগরে ফরাসীরা এবং কলিকাতায় ইংরেজেরা স্ব স্ব দুর্গ মেরামত করিয়া ও বাড়াইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। নবাব তাহাদিগকে বারণ করিলে ফরাসীরা তাঁহার আদেশ মত দুর্গের সংস্কারকার্য্য হইতে বিরত হয়; কিন্তু ইংরেজেরা

তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দুর্গ সংস্কার করিতে ও বাড়াইতে থাকে। ইহা ছাড়াও, ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসায়ে নানা প্রকার অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া নবাবের রাজস্বের ক্ষতি সাধন করিতেছিল। নবাব দেখিলেন, সময় থাকিতে ইংরেজদের দমন না করিলে পরিণামে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করা দুষ্কর হইবে।



আলিবর্দ্দী খাঁ

নবাবের রাজধানীর নিকটেই কাশীমবাজারে ইংরেজদের কুঠি ছিল। নবাব এই কুঠি অধিকার করিলেন। তারপর প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইলেন কয়েকদিন পরে কলিকাতায় পৌঁছিয়া ইংরেজদের দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

কলিকাতার এই দুঃসংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে, মাদ্রাজের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইভকে কলিকাতা অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই সেনাপতিদ্বয় সমুদ্রপথে কলিকাতায় পৌঁছিয়া একপ্রকার বিনা বাধায় কলিকাতা শহর ও দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। তারপর নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হইল।

এই সময় সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য গোপনে এক ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবাবের সেনাপতি মিরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্ল্লভ এবং মুর্শিদাবাদের ধনকুবের জগৎশেঠ। নবাবের সর্ব্বনাশ করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া ক্লাইভ তাহাতে যোগদান করিল। ষড়যন্ত্রে স্থির হইল, সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে সিংহাসনে বসান হইবে।


সিরাজউদ্দৌলা

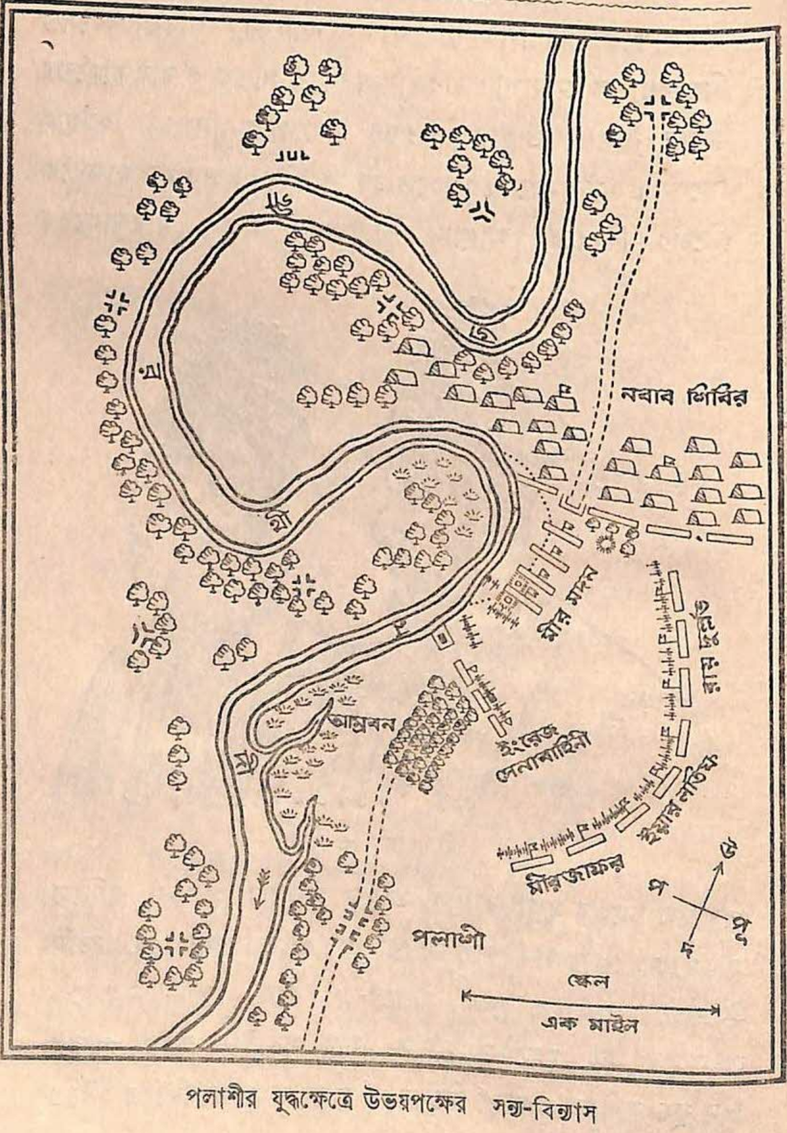
ইহার পর ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধি-ভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করিয়া সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। নবাবও তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষ ভাগীরথীর তীরে পলাশী প্রান্তরে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। প্রাতঃকালে উভয় পক্ষ অপর পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কামান হইতে গোলা ছুঁড়িতে লাগিল। মধ্যাহ্নে নবাবের সেনাপতি মীরমদন তাঁহার সৈন্যদল লইয়া প্রচণ্ড বেগে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু তিনি ইংরেজদের কামান হইতে নিক্ষিপ্ত একটি গোলার আঘাতে নিহত হইলেন। মীরমদনের নিধন সংবাদ শুনিয়া নবাব

মীরজাফরের শরণাপন্ন হইলেন। নবাবের অধিকাংশ সৈন্য বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায় তুর্ল্লভের অধীন ছিল। তাঁহারা এতক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট হইয়াই ছিলেন। মীরমদনের মৃত্যুতে হতাশ হইয়া নবাব মীরজাফরকে নিজের শিবিরে আহ্বান করিলেন। নবাব মীরজাফরের



মীরজাফর ও মীরণ

পদতলে নিজের মুকুট রাখিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে মীরজাফর কোরআন স্পর্শ করিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। তবে তিনি নবাবকে তখনকার মত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া পরের দিন যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু নবাবের শিবির হইতে



পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সন্য-বিন্যাস

বাহির হইয়াই তিনি ক্লাইভকে নবাব-শিবির আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন। এদিকে মীরজাফরের পরামর্শ অনুসারে নবাব সৈন্যদিগকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। নবাবের সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে ইংরেজ সৈন্যেরা পিছন দিক্ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। নবাব বিব্রত ও ভীত হইয়া উটের পিঠে চড়িয়া বেলা চারিটার সময় মুর্শিদাবাদের দিকে পলায়ন করিলেন; তাঁহার সৈন্যরাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় পলাশীর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহলের দিকে পলায়ন করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। তারপর মীরজাফরের পুত্র মিরণের আদেশে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হইল।

সিরাজ মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিবার পর ক্লাইভ মীরজাফরকে সিরাজের শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছিলেন। মীরজাফর নামে মাত্র নবাব হইলেন, রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা প্রকৃত-পক্ষে ইংরেজদের হস্তগত হইল।

অনুশীলনী

১। সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিবাদের কারণ উল্লেখ কর।

২। পলাশীর যুদ্ধ বর্ণনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

ওয়ারেন হেষ্টিংস

ইংরেজেরা বঙ্গদেশে আধিপত্য লাভ করিয়া যাহা খুসী তাহা করিতে লাগিল। তাহারা মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে সিংহাসনে বসাইলেন। তারপর মীরকাসিমের সহিত গোলযোগ হইলে তাহারা তাহাকে বঙ্গ-বিহার হইতে বিদূরিত করিয়া আবার মীরজাফরকে নবাব করিলেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌল্লা নবাব হইলেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবদের ক্ষমতা আরও হ্রাস পায়। কোম্পানীর গভর্ণর ক্লাইভের সহিত দিল্লীর সম্রাটের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধিদ্বারা স্থির হয় যে—বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজ কোম্পানী গ্রহণ করিবে এবং নবাবের হাতে দেশের শাসনভার থাকিবে। ইহাকে দ্বৈত-শাসন বলা হয়। এই দ্বৈতশাসনের ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা ওয়ারেন



ওয়ারেন হেষ্টিংস

হেষ্টিংসকে বঙ্গদেশের গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস বঙ্গদেশে বহু বৎসর কোম্পানীর অধীনে চাকরী করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও ছিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অনেক যুদ্ধাদি করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমেই যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার নাম রোহিলা যুদ্ধ। অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের পাদদেশে রোহিলা-খণ্ড নামক এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু হইলেও এই দেশের অধিবাসী রোহিলাদের নাম অনুসারে ঐ দেশের নাম রোহিলাখণ্ড হয়। রোহিলারা পাঠান জাতীয় মুসলমান। মারাঠাদের আক্রমণে ভীত হইয়া রোহিলা সর্দ্দার হাফেজ রহমত অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। স্থির হইল যে, মারাঠারা রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করিলে সুজাউদ্দৌল্লা যদি মারাঠাদের বিতাড়িত করিতে পারেন, তাহা হইলে রোহিলারা তাহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিবে। এই সন্ধিপত্র এক বৃটিশ সেনাপতির উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়। তারপর মারাঠারা রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করিলে সুজাউদ্দৌল্লা একদল বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়; কিন্তু হাফেজ রহমত প্রতিশ্রুত টাকা দিতে অস্বীকৃত হন। সুজাউদ্দৌল্লা এই টাকা আদায় করিবার জন্য ইংরেজদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ঠিক হইল যে, ইংরেজেরা অর্থ সাহায্যের পরিবর্ত্তে সুজাউদ্দৌল্লাকে রোহিলাখণ্ড অধিকার করিতে সাহায্য করিবেন। অযোধ্যার

নবাবের ও ইংরেজদের এক সম্মিলিত বাহিনী রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করিলে হাফেজ রহমতের নেতৃত্বে রোহিলারা তাহাদিগকে বাধা দিল। এক তুমুল যুদ্ধে রোহিলারা পরাজিত ও তাহাদের সর্দ্দার হাফেজ রহমত নিহত হইল। প্রায় বিশ হাজার রোহিলা তাহাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। অযোধ্যার নবাব রোহিলাখণ্ডকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইল।

এই সময় ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট এক আইন-প্রণয়ন করে। ইহার নাম রেগুলেটিং এ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণ আইন। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, বঙ্গদেশে একজন গভর্ণর-জেনারেল থাকিবেন এবং তাঁহাকে সাহায্য ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এক কাউন্সিল বা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা ছাড়া কলিকাতায় একটি প্রধান বিচারালয় বা সুপ্রীম কোর্টও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন অনুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংসই বাংলার প্রথম গভর্ণর-জেনারেল হইলেন। কার্য্যকালে দেখা গেল, এই আইনে সুশৃঙ্খলা অপেক্ষা বিশৃঙ্খলাই বেশী দেখা দিয়াছে। কাউন্সিলের অধিক সংখ্যক সভ্যদের শত্রুতায় ওয়ারেন হেষ্টিংসের লাঞ্ছনাও কম হইত না। ওয়ারেন হেষ্টিংসের এদেশীয় শত্রুরাও ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিত।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের এইরূপ একজন শত্রু ছিলেন। তাঁহার নাম মহারাজ নন্দকুমার। তিনি বঙ্গদেশের একজন বিশিষ্ট ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক এবং তিনি বাংলার নবাবদের অধীনে

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এক ঘুসের অভিযোগ আনয়ন করেন। হেষ্টিংসের বিপক্ষ দলের সদস্যরা কাউন্সিলে মহারাজ নন্দকুমারের সম্মুখে এই অভিযোগের তদন্ত করিতে চাহিলে হেষ্টিংস তাহাতে অসম্মতি জানান। কিছু দিন পরেই হেষ্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্তু এই বিষয়ে তদন্ত চলিবার সময়ে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির অভিযোগক্রমে জালিয়াতির অপরাধে মহারাজ নন্দকুমার ধৃত হন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারে **নন্দকুমারের ফাঁসি** হয়। মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি এই শাস্তিটি অত্যন্ত কঠোর হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। জালিয়াতির অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান তখনকার ইংল্যাণ্ডের আইনে ছিল, ভারতবর্ষের আইনে এই ব্যবস্থা ছিল না। প্রাণদণ্ডের বদলে কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা যখন সুপ্রিম কোর্টের ছিল, তখন মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি না দিয়া কারাদণ্ড দিলেই ভাল হইত বলিয়া অনেক মনে করেন।

শুধু যে কাউন্সিলের সদস্যরা ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা নহে, ভারতের দুইটি রাজশক্তির সহিত যুদ্ধেও তিনি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শক্তিশালী মারাঠা জাতির সহিত তাঁহাকে যে যুদ্ধে রত হইতে হয়, তাহা প্রথম **ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ** নামে পরিচিত। মহীশূরের সুলতান হায়দর আলীর সহিতও ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে যুদ্ধে রত হইতে হয়। এই যুদ্ধের কথা পরে বর্ণিত হইবে।

এই সকল যুদ্ধের জন্য রাজকোষের বহু অর্থ খরচ হয়।

সুতরাং অর্থের জন্য হেষ্টিংস বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বারাণসীর রাজা চৈতসিংহ কোম্পানীর অধীন এক মিত্ররাজ ছিলেন। তিনি কোম্পানীকে বৎসরে সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দিতেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার উপর কোম্পানীর আর কোন দাবীদাওয়া ছিল না। কিন্তু অর্থের জন্য বিব্রত হইয়া হেষ্টিংস তাঁহার নিকট হইতে বারংবার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেন। আর একবার তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দাবী করা হয়। চৈতসিংহ পাঁচশত অশ্বারোহী দিতে চাহিলে, হেষ্টিংস ক্রুদ্ধ হইয়া বারাণসীর দিকে রওনা হইলেন। বারাণসীতে পৌঁছিয়া হেষ্টিংস চৈতসিংহের নিকট জরিমানা স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। চৈতসিংহ এই অর্থ দিতে অসমর্থ হইলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাতে চৈতসিংহের সৈন্যরা ক্রুদ্ধ হইয়া হেষ্টিংসকে আক্রমণ করিল। চৈতসিংহও শাস্তির ভয়ে স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করেন। এই বিদ্রোহ দমন করিতে বেশী দেরী হইল না। অতঃপর চৈতসিংহের স্থলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারাণসীর রাজা করা হয়।

অর্থের জন্য বিব্রত হইয়া হেষ্টিংসকে আরও একটি অন্যায় কাজ করিতে হয়। সুজাউদ্দৌল্লার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আসফদৌল্লা অযোধ্যার নবাব হইয়াছিলেন। একদল ইংরেজ সৈন্য রাখার জন্য তিনি কোম্পানীকে কিছু অর্থ দিতেন। এই অর্থ কয়েক বৎসর ধরিয়া বাকী পড়ে। হেষ্টিংস এই অর্থ দাবী করিলে, নবাব জানাইলেন যে তাঁহার মৃত পিতার অনেক

সম্পত্তি ও অর্থ তাঁহার মাতা ও পিতামহীর হস্তগত হইয়াছে। এই অর্থের কিছুটা অংশ না পাইলে তিনি কোম্পানীর দেনা পরিশোধ করিতে পারিবেন না। অবশেষে নবাবকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কোম্পানীর একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। ইহারা বেগমদের কর্ম্মচারীদিগকে নানারূপ উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বেগমদের সঞ্চিত অর্থ কাড়িয়া লইল।

এই সকল অন্যায় কার্য্যের জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করিলে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে তাঁহার বিচার হয়। সেই বিচারে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইলেও লাঞ্ছনা, অপমান ও অর্থব্যয়ে তাঁহার দেহমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

অনুশীলনী

১। রেগুলেটিং অ্যাক্টের প্রধান ধারাগুলির উল্লেখ কর। এই আইনের কি ত্রুটি ছিল?

২। অর্থ-সঙ্কটের জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ওয়ারেন হেষ্টিংস গভর্ণর হইবার পূর্ব্বে বিহারে ও বঙ্গদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর হইয়াছিল। এই মন্বন্তর ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। এই মন্বন্তরের সময় 'কার্টিয়ার' ছিলেন বঙ্গদেশের ইংরেজ কোম্পানীর গভর্ণর এবং নজমউদ্দৌল্লা ছিলেন নবাব। মন্বন্তরের ও তাহার আগের বৎসরে অনাবৃষ্টি হয়। এই অনাবৃষ্টির ফলে পশ্চিমবঙ্গে, উত্তরবঙ্গে ও বিহারে ধান নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গেও বাখরগঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য অংশে খুব ভাল ফসল হয় নাই।

যাহাদের ঘরে কিছু ধান জমা ছিল তাহা পৌষ মাসে নিঃশেষ হইয়া যায়। যাহারা জন খাটিয়া খাইত তাহাদের অবস্থা পৌষ মাসের পূর্ব্ব হইতেই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রাজস্ব আদায়কারীরা কিন্তু রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিতে লাগিল। অন্যান্য বৎসরের চেয়েও মন্বন্তরের বৎসরে তাহাদের পীড়াপীড়ি বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলে মন্বন্তরের বৎসরে যে খাজানা আদায় হইল মন্বন্তরের পূর্ব্বে কিংবা পরে অনেক বৎসর সেরূপ আদায় হয় নাই। কৃষক এবং জন-মজুরেরা ইহাদের পীড়াপীড়ি হইতে রেহাই পাইবার জন্যও বটে, আর খাদ্য অন্বেষণের জন্যও বটে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পৌষ মাস হইতেই অনেক লোক অনাহারে মরিতেছিল, গ্রীষ্মকালে মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিল। পুকুরের জল শুকাইয়া পানের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অখাদ্য-কুখাদ্যের সহিত এই জল পান করিয়া লোকে উদরাময় ও কলেরায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে আবার বসন্তরোগ দেখা দিল। অনেক দিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধার জ্বালায় কাতারে কাতারে লোক কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বড় বড় শহরের দিকে যাইতে

লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই শহরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রাস্তার দুই ধারে মরিয়া পড়িয়া রহিল।

এই মন্বন্তরে বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক ইহলোক ত্যাগ করে। বহু গ্রাম ও নগর বনজঙ্গলে পরিণত হয়। কৃষকের অভাবে বহু জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিল। সেই সময়ে ইংরেজ কোম্পানী এক বৎসরের জন্য জমি ইজারা দিতেন। যে জমিদার বেশী রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইত সেই জমির ইজারা পাইত। এই প্রথার মস্ত বড় একটি দোষ ছিল। জমিদারেরা জানিত যে, এক বৎসর পরে জমি অন্য জমিদারের হাতে চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং এই এক বৎসরে তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে যত পারিত রাজস্ব আদায় করিয়া লইত। ইহাতে প্রজারা দরিদ্র হইয়া পড়িত। তাহারা জমির উন্নতির দিকে মনোযোগ দিত না, কারণ তাহারা জানিত যে, জমির উৎপাদন বাড়িলে জমিদারদেরই লাভ, তাহারাই বেশী রাজস্ব আদায় করিবে। এইভাবে জমিরও উন্নতি হইত না, প্রজাদেরও উন্নতি হইত না।

ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁহার পরবর্ত্তী অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল 'ম্যাক্‌ফার্‌সনও' জমি-বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কিছুই করিতে পারেন নাই। ম্যাক্‌ফার্‌সনের পরে 'লর্ড কর্ণওয়ালিস' গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। কর্ণওয়ালিস ইংল্যাণ্ডের জমিদার বংশের লোক ছিলেন। তাঁহার দেশে জমিদারগণই জমির মালিক। তিনি তাঁহার দেশের মত এই

দেশেও এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে তিনি জমিদারদের দশ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাজস্বে জমি-বিলি করিলেন। কিন্তু এই দশ বৎসরের বন্দোবস্তী শেষ হইবার পূর্ব্বেই কর্ণওয়ালিস কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের অনুমতিক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন করিলেন।


কর্ণওয়ালিস

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ঠিক হইল, জমিদারকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে হইবে, সরকার এই রাজস্ব কখনও বাড়াইবে না। এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিলে জমি চিরকালের জন্য জমিদারের হাতে থাকিয়া যাইবে। জমির উপর জমিদারেরই স্বত্ব থাকিবে, প্রজার কোন স্বত্ব থাকিবে না।

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীতে ভূমিরাজস্ব হইতে সরকারের আয় বাড়িবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। তবে আয় কমিবারও কোন সম্ভাবনা রহিল না। সুতরাং সরকার আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারিত। সরকারের জমিদারের নিকট হইতে বেশী রাজস্ব আদায় করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু জমিদারেরা ইচ্ছা করিলে প্রজাদের নিকট হইতে বেশী

রাজস্ব আদায় করিতে পারিত। এমন কি, প্রজাদের জমি হইতে উৎখাতও করিতে পারিত। অবশ্য পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে সরকার 'প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণয়ন করিয়া জমিদারদের এই ক্ষমতা অনেকটা খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিলেন।

অনুশীলনী

১। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ কি? এই মন্বন্তরের একটি বর্ণনা দাও। ইহার ফল কি হইয়াছিল?

২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাহাকে বলে? ইহার গুণাগুণ বিবৃত কর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হায়দর আলী ও টিপু সুলতান

পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে দক্ষিণ-ভারতে অবস্থিত মহীশূর রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হায়দার আলী নামক এক মুসলমান বীরের হস্তগত হয়। হায়দর আলির অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে মহীশূরে হিন্দু রাজারাই রাজত্ব করিতেন। এই রাজ্যের এক মুসলমান পরিবারে হায়দর আলির জন্ম হয়। শিবাজীর মত হায়দর আলিও বাল্যকালে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেন নাই, কিন্তু অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি শিবাজীর মত যুদ্ধবিদ্যায় পটু হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে মহীশূর রাজ্যের সৈন্য-বিভাগে সামান্য সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করেন। অতি শীঘ্রই তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া মহীশূরের মন্ত্রী তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিল। কালক্রমে হায়দর আলি মহীশূরের হিন্দু রাজাকে

সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই মহীশূরের সুলতান হইলেন। হায়দার আলি নিরক্ষর হইলেও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি পাঁচটি ভারতীয় ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন।


হায়দর আলি

কালক্রমে **হায়দর আলির সহিত ইংরেজদের বিবাদ ঘনাইয়া উঠিল।** তিনি হায়দরাবাদের নিজামের সহিত সম্মিলিত হইয়া মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না জানিয়া নিজামের সহিত সন্ধি করিয়া নিজামকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিল। কিন্তু হায়দার আলি ইংরেজবাহিনীকে বারংবার পরাজিত করিয়া **মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী হইলেন।** মাদ্রাজের ইংরেজ সরকার ভীত হইয়া **হায়দার আলির সহিত সন্ধি** করিলেন। হায়দার আলি যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, এইবার সন্ধিতে তাঁহার কূটনীতির পরিচয় দিলেন। সন্ধিতে স্থির হইল উভয়পক্ষ তাঁহাদের যুদ্ধে অধিকৃত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করিবেন। সেই সন্ধির আর এক সর্ত্তে ইংরেজেরা প্রতিশ্রুতি দিল যে, ভবিষ্যতে যদি হায়দর আলি তাঁহার শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হন, তাহা হইলে ইংরেজেরা তাঁহাকে সাহায্য করিবে।

এই সর্ত্তের মধ্যেই ইংরেজদের সহিত হায়দর আলির দ্বিতীয় যুদ্ধের বীজ নিহত হইল।

ইংরেজদের সহিত সন্ধি হইবার কিছুকাল পরে হায়দর আলি মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হন; কিন্তু ইংরেজেরা তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। ইংরেজদের এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য হায়দার আলি কোন অভিযোগ করেন নাই; কিন্তু ইংরেজদের পরবর্ত্তী এক কার্য্যে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। এই সময়ে ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরেজেরা ভারতের পশ্চিমকূলে অবস্থিত ফরাসীদের মাহে বন্দর অধিকার করিতে উদ্যত হইলে হায়দার আলি তাহাদিগকে এই কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বলেন। কারণ, মাহে বন্দর এক প্রকার তাঁহার রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ব্যতীত এই বন্দর দিয়া হায়দর আলি বিদেশ হইতে সামরিক দ্রব্যসম্ভার আনিতেন এবং বিদেশের সহিত যোগাযোগ বাজায় রাখিতেন। তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজেরা মাহে বন্দর অধিকার করিয়া লইলে, হায়দর আলি তাঁহার বিশাল বাহিনী লইয়া কর্ণাটের সমতলভুমিতে অবতীর্ণ হইলেন। হায়দর ঘরবাড়ী পোড়াইয়া যখন মাদ্রাজ শহরের চারিপাশের দেশকে শ্মশানে পরিণত করিল, তখন মাদ্রাজের ইংরেজে সরকার অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই হায়দার আলি ইহলোক ত্যাগ করেন। হায়দার আলির মৃত্যুর পরেও যুদ্ধ থামিল না। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান বিক্রমের

সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তুমুল সংগ্রামে উভয়পক্ষ ক্লান্ত হইয়া অবশেষে সন্ধি করিতে সম্মত হইল। উভয় পক্ষই কেহ কাহাকেও সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বে সন্ধি করিয়াছিল ; কিন্তু উভয়পক্ষই জানিত যে তাহাদের মধ্যে এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন না হইলে অপরপক্ষ নিরাপদ হইবে না। সুতরাং এই সন্ধি যে বেশী দিন স্থায়ী হইবে না, তাহা উভয়পক্ষই বেশ ভাল রকমেই জানিত।



টিপু

লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন, তখন ইংরেজদের সহিত টিপু সুলতানের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজা ছিলেন ইংরেজদের বন্ধু। কর্ণওয়ালিশের নিষেধ সত্ত্বেও টিপু এই রাজ্য আক্রমণ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। অবশ্য কর্ণওয়ালিশও যে এই ব্যাপারে একেবারে নির্দ্দোষ ছিলেন, এমন নহে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে নিজামের নিকট লিখিত এক পত্রে টিপুর প্রতি কর্ণওয়ালিশের শত্রুতার মনোভাব প্রকাশ পায়। কর্ণওয়ালিশের এই মনোভাব টিপুর অবিদিত ছিল না। যুদ্ধে টিপুর পরাজয় হইল। তাঁহাকে

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩৩০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিতে হয়। তিনি রাজ্যের যে অংশ ছাড়িয়া দিলেন তাহা নিজাম, ইংরেজ ও মারাঠারা ভাগ করিয়া লইল। কারণ, নিজাম এবং মারাঠারা এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করিয়াছিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পাঁচ বৎসর পরে এক বিচক্ষণ লোক কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তাঁহার নাম 'লর্ড ওয়েলেস্‌লি'। তিনি ভারতে আসিয়া দেখিলেন—নিজাম, মারাঠা ও টিপুর সেনা-বাহিনীতে ফরাসী সেনাপতিদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে এক তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লি দেখিলেন, ভারতীয় রাজাদের সেনাবাহিনী হইতে ফরাসী প্রভাব খর্ব্ব করিতে না পারিলে ভারতে ব্রিটিশ রাজ্য যে কোন মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ এই সময়ে টিপুও বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে ভারত হইতে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাবুল, আরব, কন্‌ষ্টান্টিনোপল ও মরিশাস দ্বীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মরিশাস দ্বীপের ফরাসী শাসকর্ত্তা টিপুর সহিত তাঁহার এক গোপন সন্ধির কথাও প্রকাশ করিয়া দিলেন। সুতরাং লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারত হইতে ফরাসী প্রভাব খর্ব্ব করিয়া ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপনে তৎপর হইলেন। ইংরেজদের সহিত এক সন্ধি অনুসারে নিজাম তাঁহার সেনাবাহিনী

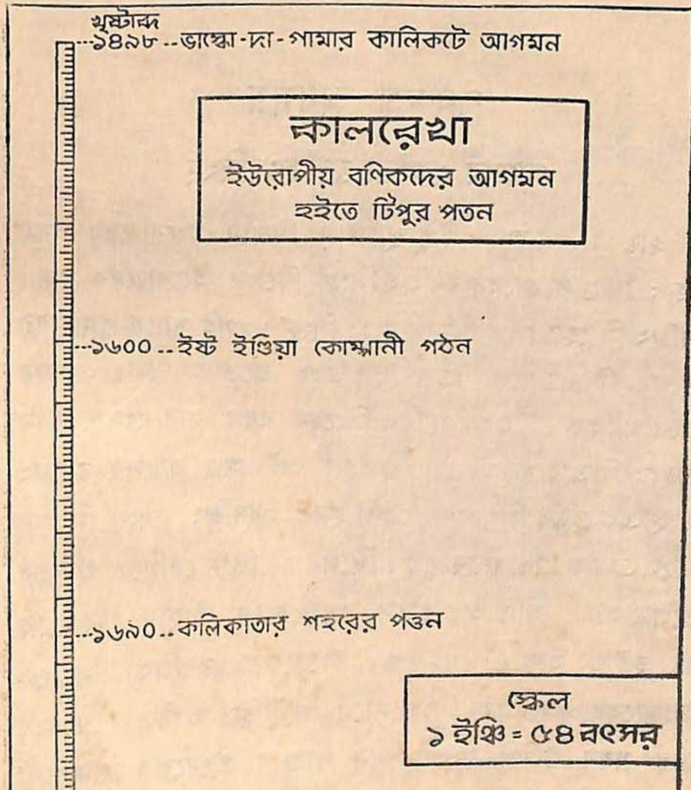
হইতে ফরাসী সেনাপতিদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। অতঃপর লর্ড ওয়েলেস্‌লি **টিপুকে** বশ্যতা স্বীকার করিতে বলেন; কিন্তু টিপু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। ইংরেজ ও নিজামের সম্মিলিত বাহিনী মহীশূর আক্রমণ করিলে টিপুও স্বীয় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীর বিক্রমে বাধা দিতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রুপক্ষের সৈন্য তাঁহার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমের দুর্গ আক্রমণ করিলে টিপু তরবারি হস্তে দুর্গের তোরণের নিকট যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে ইংরেজদের এক পরম শত্রু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। টিপুর মৃত্যুর পরে লর্ড ওয়েলেস্‌লি মহীশূর রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন এবং অবশিষ্ট অংশ প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের এক নাবালক রাজাকে ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর এই বংশের রাজারা ইংরেজদের অধীন মিত্ররূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

অনুশীলনী

১। হায়দর আলির অভ্যুত্থান ও ইংরেজদের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বের কাহিনী বর্ণনা কর।

২। টিপুর সহিত ইংরেজদের শেষ যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করিয়া যুদ্ধটি বর্ণনা কর।

৩। টিপুর মৃত্যুর পর মহীশূরের শাসন-ব্যবস্থার কি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়?



খৃষ্টাব্দ
১৪৯৮ .. ভাস্কো-দা-গামার কালিকটে আগমন
কালরেখা
ইউরোপীয় বণিকদের আগমন
হইতে টিপুর পতন
১৬০০ .. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন
১৬৯০ .. কলিকাতার শহরের পত্তন
স্কেল
১ ইঞ্চি = ৫৪ বৎসর
১৭৫৭ .. পলাশীর যুদ্ধ
১৭৬৭ .. ইংরেজদের সহিত হায়দর আলীর প্রথম যুদ্ধ
১৭৭০ .. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
১৭৯৩ .. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৭৯৯ .. ইংরেজদের সহিত টিপুর শেষ যুদ্ধ

পঞ্চদশ অধ্যায়

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ

হায়দর আলি ও টিপু সুলতান ছিলেন ইংরেজদের পরম শত্রু ; কিন্তু পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ ছিলেন ইংরেজদের বন্ধু। রণজিৎ সিংহের পিতার নাম 'মহা সিংহ'। সেই সময়ে পাঞ্জাবের শিখেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক দলের একজন নেতা থাকিত ; যখন রণজিৎ সিংহের বয়স বার বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং এই অল্প বয়সেই রণজিৎ সিংহ এক দুর্দ্ধর্ষ শিখদলের নেতা হন। রণজিৎ সিংহ নিরক্ষর হইলেও এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না। অতি অল্প বয়সে বসন্তরোগে তাঁহার বাম চোখ নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য ইংরেজেরা রণজিৎ সিংহকে 'পাঞ্জাবের একচোখো সিংহ' নামে অভিহিত করিত। তাঁহার বয়স যখন উনিশ বৎসর তখন পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোর তাঁহার হস্তগত হয়। তারপর হইতে ছলে-বলে পাঞ্জাবের অন্যান্য শিখ সর্দ্দারদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি এক বিশাল শিখ-রাজ্য স্থাপন করেন।

শতদ্রু নদীর পশ্চিমে শিখ জাতির উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিবার পরে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরাজ্য জয়ে মনোনিবেশ

করিলেন। এই সকল রাজ্যের শিখ রাজারা রণজিৎ সিংহের আক্রমণে ভীত হইয়া ইংরেজদের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরেজরা রণজিৎ সিংহের নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করিল। রণজিৎ সিংহ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধির নাম অমৃতসরের সন্ধি। এই সন্ধিতে ঠিক হইল রণজিৎ শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া আর দেশ জয় করিবেন না। ইংরেজেরাও শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া রণজিৎ সিংহের রাজ্য আক্রমণ করিবেন না। ইংরেজদের সঙ্গে রণজিৎ সিংহের এই যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল তাহা যতদিন রণজিৎ সিংহ জীবিত ছিলেন ততদিন ভঙ্গ হয় নাই।



রণজিৎ সিংহ

এই সন্ধি হইবার পর রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর পশ্চিম দিকে রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। কালক্রমে তিনি আফগানদিগের নিকট হইতে মুলতান, কাশ্মীর, পেশোয়ার

প্রভৃতি জয় করিয়া রাজ্যের সীমা উত্তরে হিন্দুকুশ হইতে দক্ষিণে সিন্ধুদেশের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে শতদ্রু নদী হইতে পশ্চিমে পেশোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সিন্ধুদেশের উপর। কিন্তু ইংরেজরা সিন্ধুদেশের আমীরদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় রণজিৎ সিংহের সিন্ধুদেশ জয় করিবার সকল আশা নষ্ট হইয়া গেল।

রণজিৎ সিংহের দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইবার পথে ইংরেজেরা বাধা সৃষ্টি করিলেও উভয়ের মধ্যে কোন যুদ্ধাদি সংঘটিত হয় নাই; বরং কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেলের সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ ও সন্ধি প্রভৃতি দ্বারা উভয় পক্ষের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইতেছিল। এই বন্ধুত্ব রক্ষা করার সহিত উভয়ের স্বার্থ জড়িত ছিল। রণজিৎ সিংহ জানিতেন তাঁহার রাজ্যকে রক্ষা করিতে হইলে ইংরেজদের সহিত সকল প্রকার বিবাদ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। তিনি নাকি ভারতের মানচিত্রে ইংরেজদের অধিকৃত স্থানসমূহ লাল রঙে রঞ্জিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "সব লাল হো জায়েগা" (সব লাল হইয়া যাইবে) অর্থাৎ কালক্রমে তাঁহার রাজ্যও ইংরেজেরা অধিকার করিয়া লইবে। ইংরেজেরাও জানিত যে কোন বহিঃশত্রু পশ্চিম দিক্ হইতে কোম্পানীর রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলে রণজিৎ সিংহের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং উভয় পক্ষের স্বার্থ উভয় পক্ষকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

রণজিৎ সিংহ জানিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে

কূটনীতিরও যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি শক্তিরও প্রয়োজন আছে। সেইজন্য তিনি তাঁহার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেক ইউরোপীয় যোদ্ধাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচালনায় রণজিৎ সিংহের সেনাবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর এই সেনাবাহিনী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কালক্রমে এই সেনাবাহিনী শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া ইংরেজদের রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরেজদের সহিত শিখদের যুদ্ধ বাধে। দুইটি যুদ্ধে শিখদের পরাজয় হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী শিখরাজ্যকে কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

অনুশীলনী

১। রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরেজদের বন্ধুত্বের মূল কারণ কি ?

২। ইংরেজদের ভারতে রাজ্য-বিস্তার সম্বন্ধে রণজিৎ সিংহ যে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন, তাহা কি ভাবে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল ?

ষোড়শ অধ্যায়

সিপাহী-বিদ্রোহ—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম

লর্ড ডালহৌসীর পর লর্ড ক্যানিং ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে কোম্পানীর সিপাহীরা বা দেশীয়

সৈন্যেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইহাই সিপাহী-বিদ্রোহ নামে বিখ্যাত। এই বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরাই যোগদান করিয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ইহাকে কেবল সিপাহীদের বিদ্রোহ বলিয়া আখ্যা দিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম। সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার অনেক কারণ ছিল।



ডালহৌসী

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে আদেশ জারী করা হইয়াছিল যে, কোম্পানীর অধীন দেশীয় রাজাদিগের পুত্র-সন্তান না থাকিলে তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কোম্পানীর অধীন কোন নিঃসন্তান দেশীয় রাজা কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত যদি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কোম্পানী ঐ পোষ্যপুত্রকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ঐ রাজ্য স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইত। এই কারণে ঝাঁসী রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। সর্ব্বশেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পোষ্যপুত্র 'নানা সাহেব' তাঁহার মৃত পিতার বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন।

কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলির রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। যে সব দেশীয় রাজা তাঁহাদের রাজ্য হারাইলেন, এবং যে সকল লোক জীবিকার জন্য ইঁহাদের উপর নির্ভর করিতেন, তাঁহারা কোম্পানীর প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু জনসাধারণ কিংবা সিপাহীদের সাহায্য না পাইলে ইঁহারা ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিতেন না।



লর্ড ক্যানিং

কোম্পানীর আমলে কতকগুলি **সংস্কারমূলক কার্য্য** জনসাধারণের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনে ও খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদের এ দেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আগ্রহে অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল যে, ইংরেজেরা এই দেশীয় লোকদিগকে কালক্রমে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ বিধি-সঙ্গত করিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দুদের মনে এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল করিয়া দেন। এমন কি—রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিও ঐ একই উদ্দেশ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিত।

এসময়ে কোম্পানীর উত্তর-ভারতের সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশই অযোধ্যা প্রদেশের ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা তাহাদের জাতিধর্ম্ম সম্বন্ধে বড়ই সচেতন থাকিত। অনেক দিন হইতে তাহাদের মনে এই সন্দেহ হইয়াছিল যে, কোম্পানীর চাকুরীতে তাহাদের জাতিধর্ম্ম বজায় থাকিবে না। তাহাদের এই ধারণা যে একেবারে অমূলক ছিল তাহা বলা চলে না। এই সময় সিপাহীদিগকে এক নূতন ধরণের বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। এই বন্দুকের জন্য যে টোটা ব্যবহার করা হইত, তাহাতে **চর্ব্বি মাখান** থাকিত। এই **টোটা** বন্দুকে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে দাঁত দিয়া ছিঁড়িতে হইত। সিপাহীরা প্রচার করিল যে, এই টোটার চর্ব্বি গরুর ও শূকরের। গরুর চর্ব্বি হিন্দুদের এবং শূকরের চর্ব্বি মুসলমানদের নিকট অপবিত্র। সুতরাং হিন্দু এবং মুসলমান সিপাহীরা মনে করিল যে, তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার এই আর একটি ফন্দি।

সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিল। প্রথমে বঙ্গদেশের **বহরমপুর ও বারাকপুরে** বিদ্রোহ দেখা দিল। তারপর সমস্ত উত্তর-ভারতে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। মিরাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ঝাঁসী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। মিরাটের সিপাহীরা ইংরেজ নরনারীদের হত্যা করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল। দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সেখানকার ইংরেজদের হত্যা করিতে লাগিল। সিপাহীরা বৃদ্ধ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর

শাহকে সিংহাসনে বসাইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিল।

লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করিল। লক্ষ্ণৌ ছিল অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী। অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করাতে এখানকার মুসলমানেরা ইংরেজ-দের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। ইহা ব্যতীত এখানকার হিন্দু অধিবাসীরাও কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সুতরাং অযোধ্যার হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীরাও বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। সিপাহীরা লক্ষ্ণৌ-এর যে বাড়ীতে ইংরেজ রেসিডেণ্ট থাকিতেন, তাহা অবরোধ করিয়া ফেলিল। এখানকার বিদ্রোহ দমন করিতে কোম্পানীর সেনাবাহিনীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।



নানা সাহেব

কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা হইলেন নানা সাহেব। ইনি কানপুরের অনেক ইংরেজকে হত্যা করিয়া অবশিষ্ট ইংরেজদিগকে একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তারপর যখন ইংরেজ সেনাবাহিনী কানপুর উদ্ধার করিতে আসিল তখন নানা সাহেবের লোকেরা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে টুক্‌রা

টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া তাহাদের মৃতদেহ একটি কূপে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর নানা সাহেব যে কোথায় পলায়ন করিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইও কোম্পানীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ঝাঁসীর সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে রাণী লক্ষ্মী-বাই তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া তোপীও তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। রাণী পুরুষের মত পোষাক পরিয়া ও ঘোড়ায় চড়িয়া বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে এই বীর রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁতিয়া তোপী বন্দী ও নিহত হইলেন। দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহার দুই পুত্র এক ইংরেজ সৈনিকের গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।


রাণী লক্ষ্মীবাই

এইরূপে এক বৎসরের মধ্যেই ইংরেজেরা বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিল

বিদ্রোহীদেরও ব্যর্থতার অনেক কারণ ছিল। অযোধ্যা ব্যতীত অন্যত্র তাহারা জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। এই বিদ্রোহ-দমনে শিখ ও গুর্খা



ঝাঁসীর দুর্গ

সৈন্যেরা ইরেজ সৈন্যদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। অনেক দেশীয় রাজার নিকট হইতেও কোম্পানী সাহায্য পাইয়াছিল। বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করিলে ইংল্যাণ্ড হইতেও বহু ইংরেজ সৈন্য ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল। সর্বোপরি বিদ্রোহ দমনে যে সকল ইংরেজ সেনাপতি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সুদক্ষ ছিলেন।

বিদ্রোহের আগুন নিবিয়া গেল। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট

ভারতের শাসনভার আর কোম্পানীর হাতে রাখা উচিত বিবেচনা করিল না। সে সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাণী ছিলেন ভিক্টোরিয়া। তিনি ভারতের শাসনভার নিজেই গ্রহণ করিলেন। এতদিন ভিক্টোরিয়া ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাণী, এইবার হইলেন ভারতের সাম্রাজ্ঞী। এইরূপে ভারতবর্ষ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন লুপ্ত হইল।



রাণী ভিক্টোরিয়া

ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী হইয়াই ঘোষণা করিলেন যে, দেশীয় রাজাদের সহিত কোম্পানী যে সকল সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তিনি সে সমুদয় মানিয়া চলিবেন। ভারতীয়দের ধর্ম্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। সকল লোককে তাহাদের যোগ্যতা ও গুণানুসারে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সরকারী পদে নিয়োগ করা হইবে। যে সকল বিদ্রোহী সাক্ষাৎভাবে হত্যার অপরাধে অপরাধী নহে, তাহাদের ক্ষমা করা হইবে।

অনুশীলনী

১। সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ কি ?
২। নানা সাহেব ও লক্ষ্মীবাই সম্বন্ধে যাহা জান বল।
৩। সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ কি ?
৪। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন-প্রণালীর কি পরিবর্ত্তন ঘটে।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতে জাতীয় কংগ্রেস
ও
স্বাধীনতা-আন্দোলন

ইংরেজদের পরাধীনতা হইতে ভারতকে স্বাধীন করিবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় সিপাহীবিদ্রোহের সময়। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হইবার অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ হইতেছে যে, অযোধ্যা প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও বিদ্রোহী সিপাহীরা জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী সংগ্রামে ভারতবাসী বুঝিল জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত কোন স্বাধীনতা-সংগ্রাম সফল হইতে পারে না। আর বুঝিল যে, সশস্ত্র সংগ্রামে ইংরেজকে পরাজিত করা নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব নহে। ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের সংগ্রাম, আর সেই সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম।

যে প্রতিষ্ঠান এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রধান অংশ গ্রহণ করে, সেই প্রতিষ্ঠানের নাম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসরই বোম্বাই শহরে বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উহার প্রথম অধিবেশন হয়। এই সময়ে কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, আবেদন-নিবেদনের দ্বারা ইংরেজদের

নিকট হইতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশের শাসনকার্য্যে কিছু অধিকার আদায় করিয়া লওয়া। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই বালগঙ্গাধর তিলক নামে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে এক বিরোধী দল গড়িয়া উঠে। এইরূপে কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়—একটি উদার বা নরমপন্থী, অপরটি চরমপন্থী।



লর্ড কার্জন

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত এবং পশ্চিমবঙ্গকে বিহারের সহিত যুক্ত করিয়া দিলে শুধু বঙ্গদেশে নয় সমগ্র ভারতবর্ষে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং আরও অনেক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগদান করিয়া এই আন্দোলনকে জোরালো করিয়া তুলিলেন। এই আন্দোলনের এক অস্ত্র ছিল ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জ্জন, আর এক অস্ত্র ছিল সন্ত্রাসবাদ অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজপুরুষদের হত্যা করিয়াশাসন-

কর্ত্তৃপক্ষদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইলে এই স্বদেশী আন্দোলন কিছুটা প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু কংগ্রেসের শক্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। এই উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থী দলও বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিল।



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবী ব্যাপী প্রথম মহাসমর আরম্ভ হইলে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করে। ভারতবাসীরা আশা করিয়াছিল যে, যুদ্ধের অবসান হইলে বৃটিশ সরকার এই

সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবে। কিন্তু যুদ্ধের পর যেটুকু স্বায়ত্ত-শাসন পাওয়া গেল তাহাতে অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহার উপর আবার দেশবাসীর অসন্তোষের বহ্নি নিবাইবার জন্য দমনমূলক আইনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। লোক ক্ষেপিয়া গেল। পাঞ্জাবের অবস্থা গুরুতর হইল। অমৃতসরে ক্ষিপ্ত জনতা কয়েক জন ইংরেজকে হত্যা করে, নিহতদের মধ্যে একজন ইংরেজ রমণীও ছিলেন। সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হইল ; কিন্তু জনসাধারণ সেই সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া জালিয়ানওয়ালা বাগ নামক স্থানে এক সভা করিল। তাহাদের সতর্ক করিয়া না দিয়াই ইংরেজ সেনাপতি নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। নররক্তে জালিয়ানওয়ালা বাগ প্লাবিত হইল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মহাত্মা গান্ধী এই বর্ব্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত হইয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিলেন। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যেমন ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন করা হইয়াছিল এই আন্দোলনেও তাহাই করা হইল ; কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মত এই আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদ ত' দূরের কথা কোন প্রকার হিংসারও স্থান ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনে প্রথমে মুসলমানেরাও যোগদান করিয়াছিল ; কিন্তু পরবর্ত্তী

কালে তাহাদের অধিকাংশ 'মুসলিম লিগ্' নামক এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে।

মহাত্মা গান্ধী শুধু যে সংগ্রামের পথেই চলিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ব্রিটিশের সহিত সম্মানজনক আপোষ করিতেও দ্বিধা করিতেন না। ভারতবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত্ব-শাসন দিতে সম্মত হইল। এই উদ্দেশ্যে লণ্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন দলের নেতারাও অহূত হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী এই বৈঠকে যোগদান করেন। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের জন্য এই বৈঠক কোন সুফল প্রসব করিল না; বরং ভারতে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হইয়া উঠিল।



মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী সময়ে সময়ে আপোষের পক্ষপাতী হইলেও কংগ্রেসের আর একজন নেতা ছিলেন যিনি ব্রিটিশের সঙ্গে কোন রকম আপোষের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র, এবং বাংলারই সন্তান। মহাত্মাজী ও নেতাজী

ভয়ের উদ্দেশ্য এক—ভারতকে স্বাধীন করা, কিন্তু উভয়ের উপায় বিভিন্ন। মহাত্মাজী অহিংসার পথ ছাড়া অন্য পথে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু নেতাজী প্রয়োজন হইলে হিংসার পথ অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। উভয়ের এই রাজনৈতিক মতের পার্থক্য অবশেষে চরমে উঠে এবং সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস ত্যাগ করিতে হয়।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র

পৃথিবী ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইলে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ শাসকদের চক্ষে ধূলা দিয়া জার্ম্মানীতে পলায়ন করেন। পরে জার্ম্মানী হইতে জাপানে এবং জাপান হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। তখন জাপানীরা ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের কাছ হইতে অধিকার করিয়া লইয়াছে। এইখানে আজাজ-হিন্দ ফৌজ নামক সেনাবাহিনী গঠন করিয়া নেতাজী পূর্ব্ব-দিকে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করেন।

জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইলে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহারা ভারতবাসীকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া শান্ত করিবার জন্য ক্রীপস্ নামক একজন ব্রিটিশ মন্ত্রীকে ভারতে প্রেরণ করে। কিন্তু তাঁহার

সমস্ত চেষ্টা ও কৌশল ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি স্বদেশে চলিয়া যাইবার পর, মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বলেন, নতুবা ভারতব্যাপী এক ব্যাপক অহিংস-আন্দোলনের সূত্রপাত হইবে বলিয়া শাসাইলেন। ভারত সরকার ইহাতে ভীত হইয়া মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করিল। ইহার ফল হইল বিষম। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে সমস্ত ভাবতব্যাপী এক বিপ্লব আরম্ভ হয়। ইহাই আগষ্ট বিপ্লব নামে বিখ্যাত।

যুদ্ধাবসানে ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারিলেন, ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানেরা বহুদিনের মনোমালিন্য ও শেষ মুহূর্ত্তের সম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইল। একখণ্ডের নাম হইল ভারত, আর একখণ্ডের নাম হইল পাকিস্তান। এইরূপে ব্রিটিশ রাজত্বের অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হইয়া স্বাধীন হইল।

অনুশীলনী

১। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা কেন?

২। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নীতির কি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন?

৩। মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাচন্দ্রের মধ্যে নীতিগত কি পার্থক্য ছিল?

কালরেখা

রণজিৎসিংহ হইতে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি

খৃষ্টাব্দ

১৮০৯..রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরেজদের অমৃতসরের সন্ধি

১৮৩৯..রণজিৎ সিংহের মৃত্যু

১৮৪৯..ইংরেজদের শিখরাজ্য অধিকার

১৮৫৭..সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৮৫..কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯০৫..বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

১৯২১..অসহযোগ আন্দোলন

স্কেল
১ ইঞ্চি = ২৭ বৎসর

১৯৪৭..ভারতের স্বাধীনতা লাভ